রবীন্দ্রনাথ

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

সোল এজেণ্ট
আর্য্য পাব্লিশিং হাউস
৬৩ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

বিষয় সূচী

১। শিল্পী রবীন্দ্রনাথ ৩

২। রবীন্দ্রনাথ ও দুঃখবাদ ১৯

৩। রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিকতা—প্রথম পর্য্যায় ৩১

৪। রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিকতা—দ্বিতীয় পর্য্যায় ৫৪

৫। রবীন্দ্রনাথের ভাষা ৬৮

৬। দূরের যাত্রী রবীন্দ্রনাথ ৭৭

৭। রবীন্দ্র-প্রতিভার ধারা ৯৭

৮। অদ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথ ১২২

রবীন্দ্রনাথ

শিল্পী রবীন্দ্রনাথ

কবি রবীন্দ্রনাথ নয়, মানুষ রবীন্দ্রনাথকে আজ আমরা একটু দেখিতে চাই। কবির ইহাতে কিছু আপত্তি হইতে পারে—তিনি হয়ত বলিবেন, তাঁহাকে সত্যভাবে দেখিতে হইলে কবি হিসাবেই দেখিতে হইবে, মানুষ হিসাবে তিনি কি করিয়াছেন বা না করিয়াছেন সেটা তাঁহার জীবনে অবান্তর কথা; তাঁহার যে সত্য যে স্বরূপ, তাঁহার মধ্যে শাশ্বত ও সনাতন যদি কিছু থাকে, তাহা তিনি ধরিয়া দিয়াছেন তাঁহার কাব্যে; বাকি যাহা তাহার কোন বিশেষ অর্থ নাই মর্য্যাদাও নাই—অন্যান্য অনেকের সহিত সেদিক দিয়া তাঁহার খুব বেশী পার্থক্য বা বিশেষত্ব না থাকিলেও থাকিতে পারে। কবির শ্রেষ্ঠ পরিচয় তাঁহার কাব্যে, অন্য পরিচয়ে তাঁহাকে ভুল বুঝা হয়, তাঁহাকে খাটো করা হয়।

কিন্তু মানুষ রবীন্দ্রনাথ বলিতে আমরা একান্ত বাহিরের বৈষয়িক বা সাংসারিক রবীন্দ্রনাথকে বুঝিতেছি

না, আমরা তাঁহার ভিতরের সেই সত্যকার মানুষটিরই কথা বলিতেছি, যাহার একটা প্রকাশ হইতেছে—কবি রবীন্দ্রনাথ। কাব্যেই হয়ত সেই মানুষটির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অথবা সর্ব্বাপেক্ষা পরিস্ফুট প্রকাশ হইয়াছে, তবুও সেই প্রকাশ যে সত্যকে যে উপলব্ধিকে, অন্তরাত্মার যে সিদ্ধিকে ব্যক্ত করিতে, আকার দিতে চাহিতেছে তাহাই আমাদের লক্ষ্য।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টির মূল কথা এবং সকলের চেয়ে বড় কথা হইতেছে ‘সৌন্দর্য্য’—তিনি দেখিতেছেন সুন্দরকে এবং দেখাইতেছেন সেই সুন্দরকে সুন্দর-ভাবে। যেখানে যাহা কিছু সুন্দর—প্রকৃতির রাজ্যে হউক আর অন্তরের রাজ্যে হউক, কায়ে হউক মনে হউক বাক্যে হউক, তিল তিল করিয়া সকল স্থান হইতে সকল সৌন্দর্য্য চয়ন করিয়া তিনি কাব্যের গড়িয়াছেন তিলোত্তমা মূর্ত্তি। তাঁহার ভাষা সুন্দর—শব্দের লালিত্য, ছন্দের লাস্য তাঁহাতে পাইয়াছে বোধ হয় পরাকাষ্ঠা। তাঁহার ভাব সুন্দর—চিন্তার বৈদগ্ধ্য, অনুভবের সৌকুমার্য্য অতি বিচিত্র ও মনোহর। তাঁহার আখ্যানের বিষয় ও বস্তু নিজে নিজেই সুন্দর; শব্দের

অলঙ্কারে, অর্থের অলঙ্কারে—মণ্ডনের উপর মণ্ডন দিয়া—তাহাকে আবার অধিকতর অলঙ্কৃত সুন্দর করিয়া তিনি ধরিয়াছেন।

তাঁহার

ঝরিছে মুকুল, কূজিছে কোকিল,
যামিনী জোছনামত্তা।
"কে এসেছ তুমি ওগো দয়াময়"—
শুধাইল নারী, সন্ন্যাসী কয়—
"আজি রজনীতে হয়েছে সময়,—
এসেছি, বাসবদত্তা।"

অথবা

তব স্তনহার হ'তে নভস্তলে খসি' পড়ে তারা,
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা,
নাচে রক্তধারা!
দিগন্তে মেখলা তব টুটে আচম্বিতে
অয়ি অসম্বৃতে!

কি একটা অপরূপ অনুপম সৌন্দর্য্যের কল্পলোকই না উন্মুক্ত করিয়া ধরিতেছে। রবীন্দ্রনাথের ভিতরের আসল মানুষটি হইতেছে এই ঐন্দ্রজালিক রূপকার।

সর্ব্বতোভাবে স্বরূপের সৃষ্টি—ইহাই তাঁহার অন্তর-পুরুষের ধর্ম্ম, তাঁহার স্বভাবের নিত্যসিদ্ধি। জ্ঞানের দিক দিয়া, শক্তির দিক দিয়া তিনি যত উপরে উঠিয়াছেন, তাহাও ছাড়াইয়া গিয়াছেন তিনি সৌন্দর্য্যের দিক দিয়া। জ্ঞান বা শক্তি তাঁহার চেতনার মধ্যে নিম্নতর স্থান পাইয়াছে, উহারা হইয়া আছে সৌন্দর্য্যের অনুগত সেবক। রবীন্দ্রনাথের অন্তর-পুরুষটি আসিয়াছে যেন এক গন্ধর্ব্বলোক হইতে। এই গন্ধর্ব্ব পৃথিবীতে অবতীর্ণ পার্থিব-জীবনে প্রকৃত সুন্দরের কিছু প্রকাশ কিছু প্রসার করিয়া দিতে। সৌন্দর্য্যকে সকল রকমে ব্যক্ত করাই তাঁহার ব্রত ও ধর্ম্ম। সুন্দর কাব্য অনেকে রচনা করিয়াছে—সুন্দরের উপরও অনেকে কাব্য রচিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই কবিশ্রেণীর মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য এইখানে যে, তাঁহার অন্তরস্থ কবি-পুরুষ তাঁহার সমস্ত সত্তা ছাইয়া রহিয়াছে। তিনি কাব্য যদি কিছু না-ও লিখিতেন, তবুও তাঁহার জীবনটিই একখানি সুন্দরের জীবন্ত কাব্য হইয়া থাকিত। নিজে তিনি সুদর্শন—তাঁহার বাক্য সুন্দর, তাঁহার ব্যবহার সুন্দর,—তাঁহার

কর্ম্ম সুন্দর, তাঁহার ধর্ম্ম সুন্দর।* নিজে চারিদিকে সৌন্দর্য্যকে সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন—সৌন্দর্য্য হইতে সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া সৌন্দর্য্যের অভিমুখে চলিয়াছেন।

বলিয়াছি রবীন্দ্রনাথের অন্তর-পুরুষ হইতেছে রূপকার। কিন্তু এই রূপ তিনি আকারের সৌষ্ঠব অপেক্ষা বিশেষভাবে ধরিয়াছেন ছন্দের স্পন্দনে। সৌন্দর্য্যের গঠন অপেক্ষা গতি, বলন অপেক্ষা চলনের উপরেই দেখি তাঁহার কারুকার্য্যে বেশী জোর পড়িয়াছে। তাঁহার কাব্যসৃষ্টিতে তাই স্থাপত্য বা ভাস্কর্য্য রীতির অপেক্ষা বেশী পাই সঙ্গীতের নৃত্যের রীতির প্রভাব। সুন্দরকে তিনি লাভ করিয়াছেন—স্থিতি নয়, গতির ভিতর দিয়া—দর্শন নয়, শ্রবণের ভিতর দিয়া। যে প্রাণের স্পন্দনে এই সৃষ্টি বিকশিত মুঞ্জরিত হইয়া উঠিতেছে, বাহ্য আকারের বা কাঠামোর পিছনে যে নিভৃত আবেগ উদ্বেলিত, কবি কান পাতিয়া তাহারই ছন্দ তাহারই সুর শুনিতে ধরিতে চাহিতেছেন।

* এখানে মনে পড়িতেছে রবীন্দ্রনাথ নিজেই একবার রামেন্দ্রসুন্দরকে যে কথায় অভিনন্দিত করিয়াছিলেন—"তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর—"।

কবি চাহিতেছেন অর্থের অন্তরালে রহিয়াছে যে ব্যঞ্জনা তাহাকে, স্থূল বাক্যের অন্তরে রহিয়াছে যে অশরীরী ভাব তাহাকে। কবি বলিতেছেন—

আমি দেখি নাই তার মুখ, আমি
শুনি নাই তার বাণী,
কেবল শুনি ক্ষণে ক্ষণে তাহার
পায়ের ধ্বনিখানি

আরও

মন দিয়ে যার নাগাল নাহি পাই,
গান দিয়ে সেই চরণ ছুঁয়ে যাই,
সুরের ঘোরে আপনাকে যাই ভুলে—

তাই দেখি রূপের আকার যেখানে রবীন্দ্রনাথ আঁকিয়াছেন, সেখানেও রূপকে স্থির করিয়া, সমাধির বিষয় করিয়া তিনি ধরেন নাই। তিনি দিয়াছেন রূপের চলমূর্ত্তি,—যেমন এই,

ধেয়ে চলে' আসে বাদলের ধারা,
নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা—

নৃত্য, ছন্দায়িত গতির মূর্চ্ছনাই দিয়াছে তাঁহার সৌন্দর্য্যের রূপায়ন। কালিদাসের কাব্যসুন্দরী সম্বন্ধে

আমরা মোটের উপর বলিতে পারি—'চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাবতস্থে' ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে দেখি—

শব্দময়ী অপ্সর রমণী,
গেল চলি, স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করি'।

তবে রহস্যের কথা এই যে, কবির শব্দময়ী অনুপ্রেরণা স্তব্ধতাকে ভাঙ্গিয়াও বেশী দূর যাইতে পারে নাই। সৌন্দর্য্যের এই যত নৃত্য, এই যত ঝঙ্কার, ইহাদের বাঁকে বাঁকে কি একটা ভাবের ঘোর, সুরের লয় এমন মীড় টানিয়া লইয়াছে যে, মনে হয় যেন তাহারা সব ফিরিয়া একটা শান্তির ও স্তব্ধতারই তটে গিয়া মিলিয়া যাইতেছে। কবির মুখরতা যেন মৌনতারই সহিত কোলাকুলি করিয়া আছে। এক দিকে দেখি রস-লিপ্সু প্রাণ প্রকৃতির বর্ণে গন্ধে হাস্যে লাস্যে পুঞ্জীভূত ঐশ্বর্য্যে মাতোয়ারা হইয়া গিয়াছে ; তাঁহার সৌন্দর্য্য-পিপাসু ইন্দ্রিয়গ্রাম বাহিরের বস্তুসম্ভারের বৈভবের দিকে পরম আগ্রহে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। আত্মাকে ভগবানকেও তাই তিনি ধরিতে চাহিতেছেন—যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের পঞ্চ-প্রাণের আলিঙ্গনে। তবুও অন্য দিকে এই সকলেরই মধ্যে তাঁহার লক্ষ্য চলিয়া গিয়াছে

অশান্তির অন্তরে যথা শান্তি সুমহান।

স্থূল শব্দের, রূঢ় গতায়াতের, হুলস্থূলের জগৎ লইয়া খেলিতে খেলিতেই তিনি ভাবে ও ভঙ্গীতে তাহাকে ছাড়িয়া উঠিয়া গিয়াছেন একটা সূক্ষ্মতর লোকে, যেখানে সুর-ছন্দ যেন সবে জন্মগ্রহণ করিতেছে— সুর-ছন্দ সেখানে কথার রূপের ভারে জড়ের অতি-স্পষ্টতা পায় নাই, তাহাতে মাখা আছে একটা শুচিতা, স্বচ্ছতা, লঘুতা, লালিত্য, লাবণ্য—সেখানে

কত যে অশ্রুত বাণী

শূন্যে শূন্যে করে কানাকানি,

*

তাদের নীরব কোলাহলে

অস্ফুট ভাবনা যত দলে দলে ছুটে চলে—

কবির আকাঙ্ক্ষা তাই হইতেছে—

যে গান কানে যায় না শোনা *

সে গান যেথায় নিত্য বাজে

প্রাণের বীণা নিয়ে যাব

সেই অতলের সভা মাঝে।

* এখানে স্মরণ করা যাইতে পারে কীট্‌স'-এর "heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter."

এ যেন প্রাচীন গ্রীকেরা যাহাকে বলিতেন music of the spheres, সেই জিনিষের মত কিছু; এখানে পাই সৌন্দর্য্যের আদি আবেগ, মূল ছন্দ। মনে হয়, প্রাণের প্রথম স্পন্দনে সৃষ্টি যখন রূপ গ্রহণ করিতে সুরু করিল—সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং—উপনিষদের এই বাক্যটি রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয় এবং প্রায়ই তিনি এটি উল্লেখ করিয়া থাকেন—তখনকার সেই প্রথম দোল, সেই প্রথম তান, সেই নাদব্রহ্মই যেন রবীন্দ্রনাথের ইষ্ট, এবং ইষ্টের সাধনায় অপরূপ সাফল্যই তাঁহার কবিত্বের বৈশিষ্ট্য ও মহিমা—এই ইষ্টের ধ্যান-মূর্ত্তি রবীন্দ্রনাথ দিতেছেন এই মন্ত্রে—

সুর গিয়েছে থেমে, তবু
থামতে যেন চায় না কভু,
নীরবতায় বাজ্‌চে বীণা
বিনা প্রয়োজনে।

ফলতঃ রবীন্দ্রনাথের মত কীট্‌সও ছিলেন একান্ত সৌন্দর্য্যেরই পূজারী, তবে ইংরেজ-কবি সৌন্দর্য্যকে কান দিয়া শুনা অপেক্ষা চক্ষু দিয়া দেখিয়াছেন বেশী—তাঁহার melodies গতির স্পন্দন অপেক্ষা ফুটাইয়া ধরিতেছে স্থির রূপ; সঙ্গীত বা নাট্য অপেক্ষা তাঁহার কবিত্বে পাই বিশেষভাবে চিত্রের রীতি। গতি, সুর, ছন্দের সূক্ষ্ম সুনিপুণ লাস্য রবীন্দ্রনাথের মত প্রাধান্য পাইয়াছে শেলীর কাব্য-প্রতিভায়।

২

সত্যের সাধনা আছে, মঙ্গলের সাধনা আছে। রবীন্দ্রনাথের কাছে সত্য ও মঙ্গল সাধনার বস্তু, তাহাদের প্রেয়ের, সৌন্দর্য্যের দিক দিয়া। সত্যের সত্যতার জন্য তিনি সত্যের ততখানি উপাসক নহেন; মঙ্গলের মাঙ্গল্যের জন্যও তিনি মঙ্গলের পূজারী নহেন। কিন্তু সত্যকার সত্য আবার সত্যসত্যই সুন্দর; পরম মঙ্গল আবার পরম সুন্দর। সুন্দর বলিয়াই সত্য ও মঙ্গল তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ প্রেমের কবি, প্রেমের মানুষ—বৈষ্ণব সাধকেরা যাহাকে বলেন 'সুপুরুষ'। কিন্তু তাঁহার প্রেমও হইতেছে সৌন্দর্য্যেরই সার। কবির প্রেম তাই কবিকে বলিতেছে—

হাত ধ'রে মোরে তুমি
ল'য়ে গেছো সৌন্দর্য্যের সে নন্দনভূমি
অমৃত-আলয়ে। সেথা আমি জ্যোতিষ্মান
অক্ষয় যৌবনময় দেবতাসমান,
সেথা মোর লাবণ্যের নাহি পরিসীমা—

প্রেমকে কেবল প্রেম হিসাবে তিনি ততখানি উপভোগ করেন নাই বড়ু চণ্ডীদাস যেমন করিয়াছিলেন ; প্রেমের মধ্যে সৌন্দর্য্য আসিয়া পাইয়াছে চরম অভিব্যক্তি, পরাকাষ্ঠা, তাই তিনি প্রেমিক হইয়া গিয়াছেন। অতি-আধুনিক অনুভূতি প্রেমকে সৌন্দর্য্য হইতে সম্পূর্ণ বিশ্লিষ্ট করিয়া ধরিয়াছে, বরং অসুন্দরেরই সহিত তাহার একটা মিলন ঘটাইতে চাহিতেছে, রবীন্দ্রনাথ এই হিসাবে পরম প্রাচীন, সনাতনপন্থী।

রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য্য হইতেছে সামঞ্জস্য, সমন্বয়, সুসঙ্গতি, প্রসন্নতা, নির্ম্মলতা, প্রশান্তি। বিরোধ যেখানে, রুক্ষতা রূঢ়তা যেখানে, সেইখানেই সৌন্দর্য্যের অভাব - সেখানে ছন্দের পতন হইয়াছে, তাল কাটিয়া গিয়াছে, সুর ভাঙ্গিয়াছে, চলনের বলনের দোষ ঘটিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ভগবান তাই হইতেছেন

সুন্দর বল্লভ, কান্ত

এবং

তাঁরি মুখের প্রসন্নতায়
সমস্ত ঘর ভরে।

এই বল্লভের কাছে কবির নিত্যকার আকিঞ্চনও তাই

নির্ম্মল কর উজ্জ্বল কর
সুন্দর কর হে

এবং

এ জীবনের যা কিছু সুন্দর
সকলি আজ বেজে উঠুক সুরে।

ভগবান ভগবান, কারণ, তিনি নিখিল বিশ্বের মিলনের সূত্র—

সবারে মিলায়ে তুমি জাগিতেছ—

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপ্রীতি আসিয়াছে এই মিলনের বা মিলের যে সৌন্দর্য্য তাহার আকর্ষণে। সমস্ত সৃষ্টি 'আকাশ আলোকে তনু মন প্রাণ' বরণীয় লোভনীয়; কারণ তাহার ভিতর দিয়া এক পরম মধুর ঐক্যতান ঝরিয়া পড়িতেছে। রবীন্দ্রনাথের মহামানবের আদর্শও আসিয়াছে এই ঐক্যতানের অনুপ্রেরণায়। পৃথিবীর সকল দেশ জাতি তাহাদের বিভিন্নতা, বৈশিষ্ট্য লইয়া পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইয়া দাঁড়াইবে—মানব-সমাজ এইভাবে পাইবে একটা সুঠাম সৌন্দর্য্য। মানুষের মধ্যে সচরাচর সমানে সমানে দেখি যে রেষারেষি, আবার নীচের প্রতি উপরের যে অত্যাচার

আর উপরের প্রতি নীচের যে দাসভাব—মানুষের এই ধরণের যাবতীয় হীনবৃত্তিই পরিত্যজ্য ; কারণ, তাহা কর্কশ অসুন্দর কুৎসিত। শান্তি, প্রীতি, ঔদার্য্য, সৌহার্দ্দ্যই মানুষকে ব্যক্তিহিসাবে ও গোষ্ঠীহিসাবে, সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতারও মূলে রহিয়াছে এই সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা। দাসত্বের মধ্যে যে শ্রীহীনতা, তাহাই তাঁহাকে বেশী পীড়া দেয়। দারিদ্র্যের স্থূল অভাবটি অপেক্ষা তাঁহার কাছে অধিক অসহ্য দারিদ্র্যের কুরূপ। মহাত্মা গান্ধীর মত তিনি যদি অভাবকে অভাবহিসাবে একান্ত করিয়া দেখিতে পারিতেন, তবে হয়ত না-হউক একটি বারের জন্য চরকায় হায় দিলেও দিতেন। কিন্তু তাঁহার কাছে স্বচ্ছলতা নিজে নিজেই কিছু সার্থক নয় ; স্বচ্ছলতা সার্থক, যদি তা হত সুছন্দ। রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা তাই ভাঙ্গন অপেক্ষা গড়নের উপর বেশী জোর দিয়াছে, বিদেশীর সহিত কলহ-কোলাহল অপেক্ষা নিজেদের মধ্যে বুঝাপড়া করা, শত্রুকে গিয়া আক্রমণ অপেক্ষা নিজের ঘর সামলান, সারান ও সাজানকেই তিনি আসল কাজ বলিয়া

বিবেচনা করেন—গড়ন অর্থ সৃষ্টি করা, তাহার অর্থ সুন্দর করিয়া রচনা করা। জাতির সমবেত জীবনের সকল অঙ্গকে পরিপুষ্ট করিয়া, ঐক্যবদ্ধ করিয়া, তাহাতে রূপগত সৌষ্ঠব ও কর্ম্মগত ছন্দ দেওয়াই হইল তাঁহার স্বদেশী-সমাজের আদর্শ।

তাই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ সুন্দর কাব্য ও সুন্দরের কাব্য যে রচনা করিয়াছেন তাহা অপেক্ষাও রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট সৃষ্টি হইতেছে, তিনি বাস্তবে, আমাদের জীবনে প্রকৃত সৌন্দর্য্যের প্রভাব কিছু নামাইয়া আনিয়াছেন, বিশেষত আমাদের বাঙ্গালীর জীবনে, আমাদের বাংলা দেশে। নিজের কাব্যসৃষ্টির মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের সমস্ত অস্তিত্ব শেষ হইয়া যায় নাই। প্রথমত, তাঁহার অনুপ্রেরণায় তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে কাব্য, চিত্র, সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয় প্রভৃতি চারুশিল্পের একটা জগৎ, নূতন একটা ধারা; দ্বিতীয়ত, তাঁহার প্রাণের স্পন্দনে আমাদের সারা দেশে একটা সুকুমার রুচি ও অনুভূতি—একটা সৌন্দর্য্যমুখী চেতনা জাগিয়া উঠিয়াছে; তৃতীয়ত, যে জিনিষটি এক হিসাবে আরও অর্থপূর্ণ, আমাদের সাধারণ ব্যবহারিক জীবনে, আমাদের

বসনে ভূষণে, আলাপে ব্যবহারে, গৃহে মজলিসে, বাস্তবের উপকরণে ও প্রয়োগে একটা নূতন সৌষ্ঠব ও পারিপাট্য যদি ক্রমশঃ দেখা দিয়া থাকে, তবে তাহার মূলে—সাক্ষাতে হউক আর অসাক্ষাতে হউক—রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অনেকখানিই রহিয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

ভারতবাসীর মধ্যে বাঙ্গালীই যা হউক একটু সৌন্দর্য্যরসিক বলিয়া খ্যাতি পাইয়াছে। এই খ্যাতি 'ঠাকুর-বাড়ী'র কল্যাণে যে অনেকখানি সম্ভব হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এক কালে আমরা কি ছিলাম, জানি না ; হয়ত আমাদের সৌন্দর্য্য-বোধ বিশেষভাবে ছিল ভাবের অন্তরের, বড় জোর শিল্পের জিনিষ ; বাহিরের জীবনে পর্য্যন্ত—জাপানীদের মত—সৌন্দর্য্যকুশলী জাত আমরা কখনও ছিলাম কি না সন্দেহ। তবুও ভিতরে বা বাহিরে যতটুকু সম্পদ বা সিদ্ধি ঐ বিষয়ে আমাদের ছিল তাহা নানা কারণে একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

প্রাণশক্তির অভাব, বৈরাগ্য, দৈন্য, নৈরাশ্য, তামসিকতা, একটা বিপুল হেলাফেলা, ঘোর বিশৃঙ্খলতা

আমাদের জীবনের রূপায়নকে কুৎসিত করিয়া তুলিয়াছিল। শেষে, যে প্রভাব রবীন্দ্রনাথে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে, বিশেষ মূর্ত্তি পাইয়াছে, তাহাই আসিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিল, খুলিয়া দিল নূতন সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির ধারা।

কেবল আমাদের দেশেরই কথা বলি কেন, কেবল বাংলায় বা ভারতবর্ষের মধ্যেই এই প্রভাবকে আবদ্ধ রাখিতে চাই কেন? আমার বিশ্বাস, ইউরোপে—পাশ্চাত্যে—রবীন্দ্রনাথ যে এতখানি আদর পাইয়াছেন, তাহা তাঁহার কবিত্বের জন্য প্রধানত নয়। কল-কারখানার, যান্ত্রিকতার, রূঢ় প্রয়োজনের শ্রীহীন জীবন হইতে মুক্তি পাইয়া আধুনিক জগৎ রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করিয়া প্রবেশ করিতেছে কোন একটা শান্তির ও শ্রীর নিকেতনে।

প্রবাসী, ১৩৩৮

রবীন্দ্রনাথ ও দুঃখবাদ

রবীন্দ্রনাথ দুঃখবাদী নহেন; জগৎটার মূল সত্য দুঃখ—দুঃখ হইতে তাহার জন্ম, দুঃখের ভিতর দিয়া তাহার লীলা এবং দুঃখেই তাহার অবসান—এই দর্শন বা এই ধরণের দর্শন রবীন্দ্রনাথের নয়। বরং উপনিষদেরই উপলব্ধি ধরিয়া তিনি বরাবর বলিয়া আসিয়াছেন—আনন্দাদ্ধি খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে ইত্যাদি।

তাই বলিয়া রবীন্দ্রনাথের জগতে দুঃখের যে কোন স্থান নাই, তাহা নয়; দুঃখের আছে একটা বিশেষ এবং অত্যন্ত প্রয়োজনের, গৌরবের আসন—রবীন্দ্র-দর্শনের বৈশিষ্ট্যই ঐ তত্ত্বের মধ্যে। তত্ত্বটি এই—

আনন্দ হইতেছে নিত্য শুদ্ধ-সত্য, আনন্দ সৃষ্টির বীজ-সত্য; কিন্তু এই আনন্দেরই একটা নিত্য-রূপ নিত্য-প্রকাশ হইতেছে দুঃখ। দুঃখের সহিত, দুঃখের অন্তরে আনন্দ রহিয়াছে ওতপ্রোত। অতি বড় দুঃখ, তীব্রতম বেদনা আনন্দ হইতেই উৎসারিত, আনন্দের একটা ঘনীভূত মূর্ত্তি।

ঔপনিষদিক উপলব্ধিতে, ভারতের গতানুগতিক অধ্যাত্ম-দর্শনে দুঃখের এই স্থান নাই। সেখানে দুঃখ অনিত্য, বিকার। দুঃখ হইল বাধা ও বন্ধন—দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তিতেই আনন্দের স্ফুরণ। অধ্যাত্ম-চেতনায়, ব্রহ্মভাবে দুঃখ নাই, তাহা কেবল আনন্দময়; সেখানে ছায়া নাই, তাহা কেবল জ্যোতির্ম্ময়; মৃত্যু নাই কেবল অমৃতময়। রবীন্দ্রনাথ এই সত্য যে দেখেন নাই বা অনুভব করেন নাই, তাহা নয়; কিন্তু ইহাকে তিনি চাহেন নাই, ইহাকে অর্দ্ধসত্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন, বৈরাগ্যের নগ্নতা বলিয়া পরিহার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ চাহিয়াছেন জাগতিক জীবন, প্রকাশের লীলা—সুতরাং দ্বৈতের বৈচিত্র্য। পৃথিবীর আকাশে তিনি চাহেন ইন্দ্রধনু ফলাইয়া তুলিতে—তাই ত তাঁহার প্রয়োজন মেঘ ও রৌদ্রের খেলা। এই জন্যই তাঁহাতে এতখানি পাই আলোর সাথে সাথে ছায়ারও পূজা, আনন্দের সাথে সাথে দুঃখের অভিনন্দন, অমৃতের সাথে সাথে মৃত্যুর আবাহন।

প্রাকৃত মন দুঃখকে যে দৃষ্টি দিয়া দেখে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সেই দৃষ্টি নয়। অধ্যাত্মবাদী দুঃখ—

পরমার্থতঃ—আদৌ নাই বলিয়া উড়াইয়া দেন। অধিভূতবাদী দেখেন কেবল দুঃখের বাহিরের দিকটা, তাহার ভার, তাহার ক্লেশ, তাহার দীনতা। রবীন্দ্রনাথ দুঃখকে এই একদিকের নাস্তিত্ব হইতে বাঁচাইয়া অন্যদিকের আবার একান্ত প্রাকৃতভাব হইতে মুক্ত মার্জ্জিত উন্নীত করিয়া তাহাকে একটা লোকোত্তর সৌন্দর্য্যের ও সত্যের আভা পরাইয়া দিয়াছেন।

নিরবচ্ছিন্ন ঐকান্তিক আনন্দ আর যেখানেই থাকুক—অক্ষর ব্রহ্মের মধ্যে হৌক কি আর কোন প্রকার স্বর্গে হৌক—প্রকাশমান জগতে, দেহ প্রাণ মনের মানুষে, তাহার স্থান নাই। তাই বলিয়া জগৎ বা মানুষ যে আবায় নিরবচ্ছিন্ন ঐকান্তিক দুঃখেরই আবাস বা আধার তাহাও নয়। লীলা হইতেছে মিশ্রণ, দুই বিপরীত বস্তুর মিলন। তবে এই মিশ্রণের মিলনের আছে একটা কৌশল, একটা গুপ্ত রহস্য—যেপথে ঐ বিভিন্ন জিনিষ দুটির একটা বিশেষ সম্বন্ধ ও সংযোগ স্থাপন হয়। আমাদের কবির উপলব্ধিতে তাহা এই—

সৃষ্টি আনন্দময়, সৃষ্টির মূল প্রতিষ্ঠা আনন্দময়; কিন্তু এই আনন্দ প্রকাশ পাইতেছে, উদ্বেল হইয়া

উঠিতেছে, নানা ভাবের মধ্য দিয়া ফাটিয়া পড়িতেছে, দুঃখের অভিঘাতে। দুঃখই এক হিসাবে আনন্দকে সচল সক্রিয় শরীরী করিয়া ধরিতেছে। দুঃখ না থাকিলে আনন্দ হয়ত থাকিত, তবে থাকিত সৃষ্টির বাহিরে, অব্যক্তের মধ্যে—কিন্তু ব্যক্তের মধ্যে, মানুষের প্রাণের মধ্যে আনন্দকে গোচর করিয়া ধরিয়াছে দুঃখই। তেমনি অমৃতত্বও মৃত্যুরই মধ্যে জীবন পাইতেছে—দেহের তটে আত্মা আসিয়া যেমন ধরা দিয়াছে, যতিরই কল্যাণে ছন্দের গতি যেমন লীলায়িত হইয়া উঠিতেছে। এই ভাবেই কবি শুনিতেছেন সীমারই মাঝে অসীমের সুর, বন্ধনের মাঝে তিনি পাইয়াছেন মুক্তির স্বাদ; অরূপের বার্ত্তা রহিয়াছে রূপের মধ্যে—ছায়াহীন 'তুমি'কে কায়া দিতেছে 'আমি'।

দুঃখ নিত্য সত্য—একান্ত দুঃখ হিসাবে নয়—তাহাতে আনন্দই জমাট অতি-তীক্ষ্ণ হইয়া আছে, তাহা বিদীর্ণ করিয়া আনন্দই বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। এই দিক দিয়া দুঃখ আনন্দেরই রূপান্তর বা নামান্তর। সেই একই দৃষ্টিতে মৃত্যুও পারমার্থিক সত্য; কারণ মৃত্যু মৃত্যু নয়, তাহা জীবনেরই ভিত্তি, জীবনেরই উৎস

—আত্মসংহত আত্মসম্বৃত জীবনেরই নাম মৃত্যু। মিলন-বিরহের সম্বন্ধও অনুরূপ। মিলনের রস, মিলনের তীব্রতা দিতেছে বিরহ। বিরহ যে ছেদ টানিয়া টানিয়া চলিয়াছে মিলন তাহারই মধ্যে নিবিড় গাঢ় হইয়া উঠিতেছে। বিরহ যদি না থাকিত, মিলনের কোন অর্থই হইত না। আর সত্যকার মিলন হয়ত ঠিক মিলনেরই মধ্যে নয়—সত্য সত্যই মিলন হইলে মিলনেরও বোধ হয় শেষ। নিত্যকার বিরহের মধ্যে যে নিগূঢ় টান, যে সান্দ্র অন্তরঙ্গতা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহাই ত মিলনের অন্তঃসার।

তাই একধাপ অগ্রসর হইয়া আমরা আরও বলিতে পারি, বাস্তবিক পাওয়ার মধ্যে বস্তুর সত্যকার পাওয়া নাই। ভগবানকে সাক্ষাৎ চোখে দেখা, আলিঙ্গন করিয়া ধরা—লাভ করা, অর্থ ভগবানকে ফুরাইয়া দেওয়া। ভগবানের অনন্ত অনিশ্চিত নিত্য লীয়মান সত্তাকে কেবল অনুসরণ করিয়া চলাই মানুষের সাধনা। চলা, নিত্য চলাই মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; গন্তব্যে পৌছান নয়, পাওয়া নয়—পাওয়া অর্থ থামা অর্থাৎ শেষ। সিদ্ধি অপেক্ষা সাধনাই বড় সত্য; কারণ সিদ্ধির অর্থ

স্থিতি, কিন্তু সাধনা হইতেছে সিদ্ধি হইতে সিদ্ধিতে ক্রমে অগ্রসর হইয়া চলা। ভগবানের দিকে নিত্য অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি, নিত্যই তাঁহার নিকট হইতে নিকটতর হইতেছি অথচ তিনি ক্রমেই দূরে দূরে সরিয়া যাইতেছেন—জীবে ভগবানে এই লুকোচুরিই হইল লীলা, সৃষ্টির মূল রহস্য। এবং এই লুকোচুরির, এই লীলার দক্ষিণেতর মুখ (negative pole) হইতেছে দুঃখ, মৃত্যু—বিরহ, বন্ধন।

'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' এই সিদ্ধান্ত রবীন্দ্রনাথের নয়; তুমি নাই আমি নাই, তুমি-আমির ওপারে আছে শুধু অনির্ব্বচনীয় একং সৎ, কিম্বা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ শিবের মধ্যে জীব নিঃশেষ লীন লয় হইয়া গিয়াছে, একান্ত জ্ঞানীর এই উপলব্ধিও রবীন্দ্রনাথের নয়। তাঁহার অনুভব, তাঁহার সিদ্ধান্ত ভক্তের, প্রেমিকের, উন্মুখী মর্ত্ত্য-মানুষের। রবীন্দ্রনাথ জগৎকে জীবনকে লীলাকে সমর্থন করিতেছেন সাঙ্গোপাঙ্গে, কায়মনো-বাক্যে; কিন্তু জ্ঞানীরা তত্ত্ববেত্তারা বলিতে পারেন এই মায়াকে সমর্থন করিতে গিয়া, মায়ার অন্তর্গত যে সকল নামরূপ বস্তুতঃ হইতেছে বিকৃতি—যাহাকে বলা হয়

মায়ার বিদ্যারূপ নয়, কিন্তু অবিদ্যারূপ—তাহাদিগকে পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করিয়াছেন, বরণ করিয়া লইয়াছেন।

অবিদ্যা শক্তির নিত্যত্ব,, পারমার্থিক অস্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ অনুভব করিয়াছেন। অবিদ্যাকে বিদ্যার সহিত, অপরা প্রকৃতিকে ব্রহ্মের সহিত, দুঃখকে আনন্দের সহিত, মৃত্যুকে অমৃতত্বের সহিত সমান স্তরে তিনি স্থাপন করিয়াছেন। অধ্যাত্ম-সাধকেরা বলিবেন রবীন্দ্রনাথের এই অনুভব মানসিক ক্ষেত্রের অথবা কল্পনাগত চেতনার—মনের উপরে অধ্যাত্মের বা পরমার্থের স্তরে উঠিলে, এই অনুভব আর পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে তুলনা করিয়া অনেক সুধী এমনও কহিতে পারেন, উক্ত তত্ত্বটি আধুনিক মনোভাবের একটি বিশেষ প্রকাশ এবং ইহার উৎপত্তিস্থল হইতেছে ইউরোপ। আত্মা ও অনাত্মার অথবা বিষয়ী ও বিষয়ের সম্বন্ধ লইয়া একটা মত জার্ম্মাণ পণ্ডিতেরা খুব চলিত করিয়া দিয়াছেন—অনাত্মা আছে বলিয়াই আত্মার অস্তিত্ব সম্ভব হইতেছে, বিষয়ী আপনাকে জানিতেছে, অনুভব করিতেছে বিষয়ের সম্পর্কে সংঘাতে

আসিয়া। এই দার্শনিক তত্ত্বটিকে খৃষ্টীয় ভক্তিরসে সিঞ্চিত করিয়া, রক্তমাংস পরাইয়া তৎসহায়ে কবি গ্যেটে ভগবান ও শয়তানের সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। করুণাময় ভগবানের রাজ্যে শয়তানের আবির্ভাব কেন হইল? শয়তান হইতেছে ভগবানের হাতে অঙ্কুশ, মানুষ যখন ঘুমাইতে ঝিমাইতে থাকে, তখন তাহাকে সজাগ করিয়া তুলিবার জন্য ভগবানের ঐ অস্ত্র, এই কথাটির একটা প্রতিধ্বনি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পাই এই ভাবে—

যখন থাকে অচেতনে
এ চিত্ত আমার
আঘাত সে যে পরশ তব
সেই তো পুরস্কার।
অন্ধকারে মোহে লাজে
চোখে তোমায় দেখি না যে,
বজ্রে তোলো আগুন করে'
আমার যত কালো॥

সে যাহা হৌক, ভারতের অধ্যাত্ম-দর্শন দুঃখ ও আনন্দ, কি অবিদ্যা ও বিদ্যার, অথবা মৃত্যু ও অমৃতত্বের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে গিয়া বলিতেছে অন্য ধরণের কথা।

তাহার সিদ্ধান্ত অনুসারে অধ্যাত্ম-চেতনায় ঐ যুগ্মের, ঐ দ্বৈতের যুগপৎ স্থান নাই। ঐ যুগলের এক-একটি হইতেছে পৃথক পৃথক লোকের বা চেতনার বস্তু—একটি হইতেছে উপরের আর-একটি নিম্নের, একটি পরা প্রকৃতির আর-একটি অপরা প্রকৃতির। উর্দ্ধতম চেতনায়, অধ্যাত্মলোকে, ভগবৎ-সান্নিধ্যে উহাদের একটিই আছে অন্যটি নাই, থাকিতে পারে না। বিদ্যাকে, আনন্দকে, অমৃতকে পাইতে হইলে অবিদ্যাকে, দুঃখকে, মৃত্যুকে সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা বর্জ্জন করিয়া আসিতে হইবে।

আমরা বলিয়াছি রবীন্দ্রনাথ এক শ্রেণীর অধ্যাত্ম-বাদীর—বৈরাগ্যতন্ত্রীর—বিরুদ্ধে ঐহিকের, পৃথিবীর, জীবনের আপনকার সত্য, নিত্য সত্য, পারমার্থিকতা স্থাপন করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু সেজন্য ঐহিকের সকল নাম সকল রূপ সকল গতিই যে পরম সত্য হওয়া প্রয়োজন তাহা না'ও হইতে পারে। ঐহিকের সত্য আছে, সার্থকতা আছে—কিন্তু তাহা যাবতীয় ব্যক্ত প্রাকৃত নামরূপের মধ্যে হয়ত নয়—নেদং যদিদমুপাসতে। দুঃখ বা মৃত্যু বা জরা বা ব্যাধি পার্থিব-জীবনের অনুসঙ্গী যতই হৌক, ইহাদের অভাবে

যে পার্থিব-জীবন থাকিতে পারে না, পার্থিব-জীবনের গভীরতম সত্যতম প্রকাশের সহিত ইহাদের যে অচ্ছেদ্য অনিবার্য্য সম্বন্ধ, এমন বাধ্যবাধকতা নাই। বরং আসল সত্য এই ধরণেরও হইতে পারে যে, জীবন জাগতিক লীলা কেবল আনন্দের অমৃতত্বের সৌন্দর্য্যের চির-যৌবনের বিগ্রহ না হইয়া যদি অন্য রকম হইয়া থাকে তবে তাহার অর্থ জীবনে, মানুষের আধারে অশুদ্ধির জন্য উহারা বিকৃত হইয়া দুঃখ, মৃত্যু, শ্রীহীনতা, জরারূপে দেখা দিয়াছে। এই অশুদ্ধির জন্যই আমাদের আশঙ্কা হয় দ্বৈতকে নষ্ট করিতে গেলে লীলার বৈচিত্র্য তীব্রতা বুঝি লোপ পাইবে।

গভীরতর জ্ঞানের সিদ্ধান্ত কি হইতে পারে এবং রবীন্দ্রনাথের অনুভবের পশ্চাতে কি তত্ত্ব রহিয়াছে—এই দুই-এর পার্থক্য আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু কবির কবিত্বের কথা তাহাতে কিছু উঠে নাই। কবির লক্ষ্য সার্ব্বাঙ্গিক সত্য, অখণ্ডজ্ঞান কিছু নয়; তাঁহার কাজ তাঁহার অনুভবকে উপলব্ধিকে—তাহা যে জগতে হোক—যতদূর সম্ভব তীব্র করিয়া জাগ্রত করিয়া দেখান—এবং এই একতানতার জন্য যদি সেই অনুভব

উপলব্ধিতে বাস্তবতার দিক দিয়া সত্যাভাস এমন কি অসম্ভব কিছু আসিয়া মিশিয়াছে দেখা যায় তাহাতে কবিত্ব হিসাবে ক্ষতি হয় না, বরং হয় ত উৎকর্ষই হয়—কবির কবিত্বশক্তির যাদুতে দোষই গুণ হইয়া দাঁড়ায়।

তা ছাড়া জ্ঞান হিসাবেও রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি চরম আধ্যাত্মিকতার শিখরে যদি না-ই পৌঁছিয়া থাকে, তবুও মানুষের সাধনায় স্থান বা সার্থকতা তাহার কিছু কম হইবে এমন নয়। একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝিব রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধ ইষ্ট হইতেছে 'সম ব্রহ্ম'—যে অনির্ব্বচনীয় সত্য রহিয়াছে সর্ব্বত্র সমানভাবে—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—সুখে দুঃখে, পাপে পুণ্যে, জীবনে মৃত্যুতে, স্বর্গে মর্ত্তে, এ-লোকে ঐ-লোকে এবং যাহার সৌন্দর্য্যের আভায় অতি কুৎসিতও সুন্দর হইয়া দেখা দেয়—যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।

এই সম ব্রহ্মের পরে হয়ত আছে সক্রিয় ব্রহ্ম। তাহার সত্য, তাহার রহস্য অন্য প্রকারের; কিন্তু তাহার প্রতিষ্ঠা এই সম ব্রহ্ম।

গোড়ায় প্রাকৃত জনের একান্ত রূঢ় দুঃখবোধ, অন্তিমে নিরাবিল নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ। মাঝখানে

হইতেছে আনন্দীভূত দুঃখ—দুঃখ যেখানে পরিবর্ত্তিত রূপান্তরিত হইতেছে। রবীন্দ্রনাথ সেই অন্তর্ব্বর্ত্তী জগতের স্রষ্টা। তিনি বিদ্যাকে আশ্রয় করিয়া কি প্রকারে অমৃতত্ব লাভ করিতে হয় সে রহস্য আমাদিগকে হয়ত দিয়া যান নাই, তিনি দিয়াছেন অবিদ্যাকে ধরিয়া কি প্রকারে মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে হয় সেই রহস্য।

বিচিত্রা, ১৩৩৮

রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিকতা

(প্রথম পর্য্যায়)

রবীন্দ্রনাথে বাংলা সাহিত্য সম্পূর্ণরূপে আধুনিক হইয়া উঠিয়াছে। এক কথায় যদি বলিতে হয় তবে বলিব, ইহাই রবীন্দ্রনাথের দান এবং সূত্রটির মধ্যে কবির সৃষ্টির স্বরূপও সম্যক্ আমরা ধরিতে পারিব। বলা বাহুল্য, আধুনিকতার অবতরণিকা রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বেই সুরু হইয়াছে; কিন্তু তাহার যে প্রবাহ, যে বন্যা বাঙ্গালীর মনপ্রাণকে চারিদিক হইতে ডুবাইয়া দিয়া গিয়াছে, তাহা আসিয়াছে রবীন্দ্রনাথ হইতে। আধুনিকতার আরম্ভের দুইজন প্রধান শিল্পীকে আমরা স্মরণ করিতে পারি—মধুসূদন ও বঙ্কিম। কিন্তু তাঁহাদের দৃষ্টির মধ্যে তবুও আছে একটা অতীতের রেশ, তাঁহাদের ভাবে ভঙ্গীতে কোথাও রহিয়া গিয়াছে একটা গতকালের, পুরাতনের আভাস। ঈশ্বরগুপ্ত-দীনবন্ধু হইতে বঙ্কিম-মধুসূদনে—কাল হিসাবে নয়, কিন্তু ধর্ম্ম হিসাবে—যে ব্যবধান, তাহা একটা বিপর্য্যয়ই। এইটুকু অবকাশে

বাঙ্গালীর মতিগতির রসবোধের মুখ সম্পূর্ণ ঘুরিয়া গিয়াছে। আধুনিকতার পাকা সড়কে বঙ্কিম-মধুই বাঙ্গালাকে তুলিয়া দাঁড় করাইয়াছেন। তবুও, সে পথে উঠিয়াও প্রাচীন.যুগের ধরণ-ধারণ—কেমন যেন মাঠ-ঘাটের গন্ধ, কাদামাটির স্পর্শ—আমরা একেবারে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারি নাই। রবীন্দ্রনাথের প্রসাদে আমরা সেখানে গাড়ী-যুড়ী—গাড়ী-যুড়ী কেন, রেল-মোটর পর্য্যন্ত চালাইয়া দিয়াছি।

আধুনিক অর্থে বর্ত্তমান বটে—কিন্তু জিনিষটি কেবল কালগত নয়, উহার মধ্যে আছে আবার একটা দেশগত গুণ। আধুনিক আধুনিক হইয়াছে বিশ্বজগতের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সংমিশ্রণের কল্যাণে। জাতিতে-জাতিতে দেশে-দেশে নিবিড়তর আদান-প্রদান প্রত্যেক জাতিকে দেশকে দিয়াছে একটা অভিনব রূপ, অভিনব ধর্ম্ম—এইভাবে যে অভিনবত্ব গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাই বোধ হয় আধুনিকতার বৈশিষ্ট্যের প্রধান অঙ্গ। মধুসূদন-বঙ্কিম যে আধুনিক, তাহার অর্থ এই—তাঁহারা বাঙ্গালীর শিল্পচেতনায় ইউরোপীয় হাবভাব আনিয়া ঢালিয়া দিয়াছেন। ইউরোপই হইল আধুনিক যুগের

ধর্ম্মক্ষেত্র, পীঠস্থান। বর্ত্তমান যুগে মানবজাতির যে মুখ্য লীলাধারা, তাহা ইউরোপের উপর দিয়া বহিয়া চলিয়াছে। সুতরাং ইউরোপের সংস্পর্শে আসা অর্থ ই আধুনিক হইয়া উঠা—পৃথিবীর রঙ্গক্ষেত্রে সম্মুখের আসন গ্রহণ করা। এসিয়ায় জাপান এই ভাবেই আধুনিক হইয়া উঠিয়াছে—আর ইহার অভাবে চীন তাহা পারে নাই। আমরা ভবিষ্য যুগের কথা বলিতেছি না, বলিতেছি গতকল্যের ও বর্ত্তমানের কথা। ভারতের মধ্যে বাঙ্গালীই সকলের আগে ও সকলের অপেক্ষা বেশী ইউরোপীয় হইয়া গিয়াছিল বলিয়াই না আজ তাহার কৃতিত্ব অন্যান্যের সাফল্যকে ছাড়াইয়া গিয়াছে? ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত, দীনবন্ধু পর্য্যন্তও বাঙ্গালীর চিত্ত একান্ত বা মুখ্যতঃ ছিল বাঙ্গালী-ই; তাহার কল্পনা, তাহার অনুভব, তাহার চেতনা তাহার সঙ্কীর্ণতর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। বঙ্কিম-মধুসূদন সেই বৈশিষ্ট্যের, সেই সঙ্কীর্ণতার, সেই বাঙ্গালীত্বের—প্রাদেশিকতার দেউল ভাঙ্গিয়া দিলেন তাহার মধ্যে আনিয়া মিশাইলেন দেশান্তরের কল্পনা, চেতনা, রীতিনীতি।

রবীন্দ্রনাথও এই কাজই করিয়াছেন, কিন্তু আরও

সূক্ষ্মতর, আরও গভীরতর, আরও ব্যাপকতর ভাবে। প্রথমতঃ, আধুনিকতার প্রথম যুগে দেশীয় ও বিদেশীয় ধারা দুইটি একসঙ্গে হইলেও সম্পূর্ণ মিলিয়া-মিশিয়া যাইতে পারে নাই—পাশাপাশি তাহারা ছিল, তাহাদের মধ্যে ছিল একটা ছেদ, একটা বৈসাদৃশ্য ও দ্বন্দ্ব—তেল-জলের মত। মধুসূদনে এই দুই সুর স্পষ্ট পৃথক বাজিয়া চলিয়াছে—বঙ্কিমেই প্রথম সত্যকার সমন্বয় ঘটিতে সুরু করিয়াছে। তবুও সে যুগের শিল্পরচনা মোটের উপরে দেখিলে মনে হয় যেন দেখিতেছি নীচের অর্দ্ধে গিলে-কোঁচান, এলায়িত ধুতির লাস্য, আর উপরের অর্দ্ধে কোট, ওয়েস্টকোট, নেকটাইর কড়া বন্ধন। নিজের নিজের দিক হইতে দুই-ই সুন্দর, সুষ্ঠু—কিন্তু উভয়ের সংযোগে সমন্বয় নাই, ঐক্যতান নাই। রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য—এই ঐক্যতান তিনি পূর্ণরূপে দিয়াছেন। বাঙ্গালীর রস-সৃষ্টিতে বাহিরের মুক্ত হাওয়া খেলাইয়া প্রাদেশিকতাকে তিনি দূর করিয়াছেন, অথচ তাহা বৈদেশিকতার কোলে গিয়া পড়ে নাই, কৃত্রিম পরানুকরণ বা প্রতিধ্বনিমাত্র হইয়া উঠে নাই—তাহা হইয়াছে সার্ব্বদেশিক। সর্ব্বতোভাবে বাঙ্গালীরই জিনিষ

তাহা, অথচ আবার মানব-সাধারণের আপনার হইয়া গিয়াছে। বিশ্ব ভূপর্য্যটন করিয়া সে চেতনা ঘরে ফিরিয়াছে, গভীরতর বৃহত্তর ভাবে ঘরের জিনিষ হইয়া উঠিয়াছে। তাই ত' কবি বলিতেছেন—

দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি
সেই দেশ লব যুঝিয়া !—

এই যেমন স্যুইন্‌বার্ণ বা মেটেরলিঙ্কে যে ভাবভঙ্গী মতিগতি রূপ পাইয়াছে তার এক-একটা তরঙ্গ রবীন্দ্রনাথে কোথাও ধরা দিয়াছে বলা যাইতে পারে। তবে পাশ্চাত্যের যাহা নিজস্ব বিশিষ্ট জিনিষ, রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণার আগুনে গলিয়া গিয়া, তাহা রবীন্দ্রনাথেরই —বাঙ্গালীর নিজস্ব সত্তার মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে, হইয়া উঠিয়াছে তাহার চিরকালের সম্পদ। দেশ হিসাবে, রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি এইরকমে তির্য্যক্‌ভাবে প্রসারিত হইয়াছে, আলিঙ্গন করিয়াছে বিশ্বকে। কাল হিসাবেও তাহা আবার অন্যদিকে বর্ত্তমান হইতে উঠিয়া গিয়াছে অতীতে। বৈষ্ণব-সাধকের অনুভব, উপনিষদের অনুভবের রাজ্যে তিনি চলিয়া গিয়াছেন—এই দিককার অনুভবকে লইয়া নামিয়া আসিয়াছেন আবার সেই

তির্য্যক্-প্রসারিত বিশ্ব-অনুভূতির মধ্যে। এই দুই-এর মিলনকে সংযুক্ত করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার কাব্য-জগতের আধুনিকত্ব, যাহার প্রধান কথা হইল প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের, অতীতের ও বর্ত্তমানের একটা সামঞ্জস্য ও সমীকরণ। এইভাবে প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের অতীতের ও বর্ত্তমানের বিশিষ্ট অনুভূতি-উপলব্ধি, ভাব-চিন্তা কবির নিবিড় রসবৈদগ্ধ্যের মধ্যে মিলিয়া-মিশিয়া একটা সমৃদ্ধতর সৃষ্টি প্রকাশ করিয়াছে—সেখানে একপ্রাণতা একতানতা লইয়া একটি বৃহৎ বৈচিত্র্য তাহার অনবদ্য সৌন্দর্য্য লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটি পাশ্চাত্যের ও আর-একটি ভারতের নিজস্ব ধারা, অথবা একটি অতীতের ও আর-একটি বর্ত্তমানের ধারা কি ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে তাহা সুন্দর গবেষণার বিষয়। আমার লক্ষ্য তাহা নয়, বিষয়টির দুই-একটি প্রধান সূত্র শুধু ধরাইয়া দিতে চেষ্টা করিব। ইউরোপীয় চেতনার, বিশেষতঃ আধুনিক ইউরোপীয় চেতনার, মূল উপলব্ধি হইতেছে এই স্থূল জগতের, এই জাগ্রত পঞ্চেন্দ্রিয়গত আয়তনের, এই যৎকিঞ্চজগত্যাং জগতের একান্ত সত্যতা, অনিবার্য্যতা,

জীবন-মৃত্যুর, জীবন হইতে হয়ত বেশি মৃত্যুর, সুখ-দুঃখের, সুখ হইতে বেশি দুঃখের, আলো-ছায়ার, আলো হইতে বেশি ছায়ার, দ্বৈতের, দ্বন্দ্বের, মানবতার সৌন্দর্য্য ও সার্থকতা। এই ভাবের ভাবুক হইয়াই আমাদের কবি বলিয়াছেন—

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়—

অথবা,

শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান ?—

কিম্বা,

কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো !
বিরহানলে জ্বালোরে তারে জ্বালো।

ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতির প্রপঞ্চের পূজা আমাদের দেশে যে কিছু কম তাহা বলি না। কালিদাসে জয়দেবে ইন্দ্রিয়ালুতার যে ঐশ্বর্য্য পুঞ্জীভূত, তাহার তুলনা জগতের অন্যান্য সাহিত্যে খুব অল্পই মিলে। তবুও পার্থক্য একটা আছে। যে চেতনা, যে মনোভাব লইয়া ইউরোপ ইন্দ্রিয়গত জগৎকে বরণ করিয়াছে, আলিঙ্গন দিয়াছে, তাহা হইল Profane, Pagan—লৌকিক, বৈষয়িক, স্থূলকে একান্ত স্থূলভাবে ধরিয়া

ছুঁইয়া যে আনন্দ যে অন্তরঙ্গতা আমরা অনুভব করি, শরীর শরীরকে জড়াইয়া যে সরসতায়, যে মার্দ্দবে, যে কারুণ্যে ভিজিয়া উঠে। ইউরোপের কবি ভার্জ্জিলের কথায়, সব মর বস্তুরই অন্তরে অন্তরে জমিয়াছে যে অশ্রুর উৎস—sunt lacrymæ rerum—তাহারই অনুপ্রেরণায় চলিয়াছে ইউরোপের শিল্পীচিত্ত। ভারতীয় চেতনা পার্থিবকে ধরিয়াও একান্ত পার্থিব সম্বন্ধেরই মধ্যে সকল পরিচয় নিঃশেষ করিতে পারে নাই। উপনিষদে যেমন বলিয়াছে, পতি প্রিয় যদি হয়, পত্নী বা পুত্র প্রিয় যদি হয় তবে তাহা পতি হিসাবে, পত্নী হিসাবে বা পুত্র হিসাবে নয়—কিন্তু আত্মার হিসাবে; জগতে যাহা কিছু প্রিয় তাহা প্রিয় তাহার নিজের জন্য নয়, কিন্তু আত্মার জন্য, 'আনন্দে'র জন্য। চেতনার এই যে আধ্যাত্মিক বা অতীন্দ্রিয় প্রতিষ্ঠা তাহা ভারতের সকল মানুষ বা সকল শিল্পীর মধ্যে যে সজ্ঞানে প্রস্ফুট ও সক্রিয় তাহা নয়। কিন্তু ভারতের আকাশে বাতাসে, জলে মাটিতে এই ভাব ছড়াইয়া ওতপ্রোত হইয়া আছে; তাই তাহার এই ভাব মোটের উপর সকলের চেতনায় —শিল্পীদের শিল্পরীতিতে আনিয়া দিয়াছে একটা বিশিষ্ট

ভঙ্গী, একটা নিজস্ব সুর। বৈষ্ণব কবিদের রচনায় পার্থিব রসের প্রাচুর্য্য, আতিশয্যই ফুটিয়া উঠিয়াছে; কিন্তু সেই রসকে অনেক স্থলে কেবল নামমাত্র ভগবানের সহিত জুড়িয়া যে দেওয়া হইয়াছে, শুধু সেই জন্যই সেখানে কি দেখা দেয় নাই একটা বৈশিষ্ট্য— যাহাকে ঠিক পরিচিত ঐহিকতার মানবতার পর্য্যায়ে ফেলিতে পারি না? আর কিছু না হোক পৃথিবীর বস্তু ইন্দ্রিয়ের বিষয়, সেখানে তাহাদের নিজস্ব মুল্য আপনারই সত্য লইয়া ফুটিয়া উঠে নাই—তাহাদের মূল্য নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে ভিন্ন একটা জিনিষের মূল্যের তুলনায়, তাহাদের সত্য যাচাই হইয়াছে, অন্য-কিছু সত্যের প্রতীক অবলম্বনে বা প্রতিবন্ধক হিসাবে। অবশ্য ইউরোপেও এমন কবি-শিল্পী যে না আছে তা নয়, যিনি মরের পশ্চাতে অমরের অনুভূতি, জড়ের উপর চৈতন্যের উপলব্ধি পাইয়াছেন, যিনি নিভৃততর অনুভূতি উপলব্ধিটিকেই এত বড় করিয়া দেখিয়াছেন যে, তাহার বাহন নামরূপ, পার্থিব আকার প্রায় গৌণ —ছায়া প্রতিবিম্ব মাত্র হইয়া পড়িয়াছে। ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থের দৃষ্টিতে প্রকৃতির সকল সত্য, সকল সৌন্দর্য্য

নিহিত প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী যে শক্তি—যাহার নাম দিয়াছেন তিনি Spirit—একান্ত তাহারই মধ্যে।

রবীন্দ্রনাথ বিষয়কে বিষয় ভাবেই, দেহকে দেহ দিয়াই ধরিতে ছুঁইতে চাহিয়াছেন। অধ্যাত্মদ্রষ্টার মত বিষয়কে কেবল আত্মার সহায়ে, শরীরকে অশরীরীর সহায়ে আলিঙ্গন করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। মর-জীব হিসাবে তিনি মর-বস্তুর রস গ্রহণ করিয়া চলিয়াছেন। অথচ এই মরত্বেরই মধ্যে আবার অমরত্বকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, দেহকে দেহভাবে ধরিয়াই তাহার সহিত যোগ করিয়া দিয়াছেন আত্মিক অদেহী একটা কিছু। এই দ্বৈতের, বৈপরীত্যের সমন্বয় তাঁহার উপলব্ধির প্রধান বৈশিষ্ট্য। পার্থিব রুচিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, তাহাকে আরও তীক্ষ্ণ তীব্র করিয়া ধরিয়াছেন—Pagan-এর লোকায়তদেরই মত; অথচ তাহার মধ্যে অপার্থিবের ধারা একটা নামাইয়া আনিয়াছেন। অপার্থিব বস্তুটির জন্য তিনি চলিয়া গিয়াছেন তাঁহার দেশের নিজস্ব সুপ্রাচীন ঔপনিষদিক চেতনার দ্বারে। এই অপার্থিব ও পার্থিবের মধ্যে, আত্মার ও দেহের মধ্যে একান্ত অন্তরের ও একান্ত

বাহিরের মধ্যে যে সেতু সংযোগসাধন করিয়াছে তাহা হইল বৈষ্ণবের, ভক্তের, প্রেমিকের, রসিকের হৃদয়ালুতা।

ঔপনিষদিক যে এক অদ্বিতীয়, অনন্ত আনন্দ ব্রহ্ম—যে বৃহৎ যে ভূমা, সকল সীমাকে সকল খণ্ডকে ছাড়াইয়া গিয়া বা ঘিরিয়া ধরিয়া আছে, যাহা অসীম অখণ্ড রবীন্দ্রনাথ তাহাকে প্রধানতঃ উপলব্ধি করিয়াছেন প্রাণরূপে। এই প্রাণের জয়, প্রাণের মাহাত্ম্যই তিনি প্রতিপদে গাহিয়া চলিয়াছেন—উপনিষদের এই মহাবাক্য বার বার উল্লেখ করিয়াছেন—

সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং—

নিজেও ঐ ভাবের ভাবুক হইয়া বলিতেছেন—

ডুব দিয়ে এই প্রাণ-সাগরে
নিতেছি প্রাণ বক্ষ ভ'রে।

এই প্রাণের লাস্যই তাঁহার মধ্যে আনিয়া দিয়াছে সচলতার, গতির প্রাধান্য। আধুনিক চিত্তবৃত্তির আর-একটা বৈশিষ্ট্য এই দিক দিয়া আবার তাঁহাতে দেখা দিয়াছে। কিন্তু আধুনিক প্রাণবাদীদের সাথে রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য এইখানে যে গতিকে সচলতাকে বড় করিলেও তাহাকে একান্ত করিয়া তিনি ধরেন

নাই। তাহার মধ্যে বা পিছনে একটা স্থিতির আভাস তিনি রাখিতে সচেষ্ট হইয়াছেন, তাহাকে পৌঁছাইয়া দিতে চাহিয়াছেন পরিশেষে একটা মহাশান্তির মধ্যে। দ্বন্দ্বের বহুর বাহিরের উচ্ছল উদ্বেল ধারায় নিজেকে ছাড়িয়া দিয়াও একটা দৃষ্টি একটা অনুভব তিনি রাখিয়াছেন ভিতরের অন্তঃপুরের দিকে, যেখানে সব শান্ত স্তব্ধ স্তিমিত –একং। তিনি বলিতেছেন বটে—

রাখোরে ধ্যান, থাক্ রে ফুলের ডালি,
ছিঁড়ুক্ বস্ত্র, লাগুক্ ধূলাবালি,—

কারণ, তাঁহার আসল পুরাপুরি কথা হইতেছে এই—

বাইরে তখন যাস্ রে ছুটে,
থাক্‌বি শুচি ধূলায় লুটে,
সকল বাঁধন অঙ্গে নিয়ে
বেড়াবি স্বাধীন,—
অন্তরেরি অন্তঃপুরে
থাক্ রে ততদিন।

রবীন্দ্রনাথ যে প্রাণের পূজা করিতেন তাহা হইতেছে প্রাণব্রহ্ম—এই প্রাণব্রহ্মই তাঁহার চেতনায় জগৎকে যেমন জগৎ করিয়া রাখিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি

তাহাতে সজীব সজাগ করিয়া ধরিয়াছে জগদাতীতের একটা ইঙ্গিত আভাস।

রবীন্দ্রনাথের এই দিকটির উপর আমরা এতখানি জোর দিতেছি এইজন্য যে, আধুনিকতার—অথবা অব্যবহিত ভবিষ্যতার—একটি, একটি কেন, হয়ত মূল রহস্যই এইখানে। বাস্তবের বাস্তবতা না হারাইয়া তাহার মধ্যে অবাস্তবকে পাওয়া ও প্রতিষ্ঠা করা—বাস্তবকে অবাস্তবের শরীর করিয়া ধরা, অবাস্তবকে বাস্তবে রূপান্তরিত করা। অবাস্তবের অঞ্জন পরিয়া বাস্তবকে একেবারে ভুলিয়া না গেলেও, বাস্তবের নিজস্ব রূপকে ভাবকে চাপা দিয়া, তাহার উপর অবাস্তবের আলেপ মাখাইয়া বাস্তবকে আমরা নূতন করিয়া, অবাস্তব করিয়াই দেখি—প্রাচীন আধ্যাত্মিকতার এই ছিল ধারা। কিন্তু আধুনিক চাহিতেছে বাস্তবের স্বরূপ-স্বভাবকে জাগ্রত রাখিয়া, তাহার বৈশিষ্ট্যকে অটুট রাখিয়া তাহাতে অবাস্তবকে মূর্ত্ত ও বাস্তব করিয়া ধরিতে। কবির

সীমার মাঝে, অসীম, তুমি—

দিয়াছে এই প্রয়াসের এই প্রেরণার মন্ত্র।

রবীন্দ্রনাথ

মানবজাতির সমস্ত ভবিষ্যৎ এই সাধনার উপর, এই সাধনার গভীরতর সিদ্ধির উপর নির্ভর করিতেছে —আমাদের বিশ্বাস। এবং এই হিসাবে কবি রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে ঋষি রবীন্দ্রনাথ হইয়া উঠিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ আধুনিকতার একজন অগ্রণী, দিশারী —আধুনিক জীবনসাধনার যে মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য তাহা তাঁহাতে বাণী পাইয়াছে, মন্ত্ররূপ ধরিয়াছে। কিন্তু লক্ষ্য ছাড়া আধুনিক চেতনার গড়ন, ভাবটি ছাড়া তাহার ভঙ্গী রবীন্দ্রনাথে কেমন প্রতিফলিত হইয়াছে তাহাও এক দেখিবার জিনিষ।

বাংলায় মধুসূদন যেদিন পয়ারের সমতা ভাঙ্গিয়া অমিত্রাক্ষরের বিষমতা সৃষ্টি করিলেন, সেদিন একটা যুগপরিবর্ত্তন ঘটিল। ইউরোপেও ভিক্টর হিউগো যেদিন আলেকসান্দ্র্যাঁ নামক ক্লাসিকাল ছন্দের কঠোর বাঁধনছাদন বিধিনিষেধ কাটিয়া একটা মুক্ততর লঘুতর গতি দিলেন সেদিনও একটা অনুরূপ যুগান্তর আসিয়াছিল। এই যুগান্তরেরই নাম আমি দিতে চাই আধুনিকতা। আধুনিকতার প্রধান লক্ষণ, বিশিষ্ট ভঙ্গী আমি নির্দ্দেশ করিব কাব্য-রচনার একটি প্রক্রিয়াকে

ধরিয়া—সে প্রক্রিয়াটি হইতেছে ফরাসীরা যাহাকে বলে enjambement, আমাদের আলঙ্কারিকেরা কাব্যের দোষ দেখাইতে গিয়া যাহার নাম দিয়াছেন 'অর্দ্ধান্তরৈক-বাচকত্ব', অর্থাৎ এক পংক্তির বা পদের জের আর-এক পংক্তিতে বা পদে টানিয়া লওয়া; আধুনিকেরা এই জের টানিয়াছেন শুধু কথা হিসাবে নয়, কথা হিসাবে, অর্থ হিসাবে, ছন্দ হিসাবে—সর্ব্বতোভাবে।

বাঙালীর পয়ার, ইংরাজের heroic couplet বা ফরাসীর alexandrin ছিল একটা বিশেষ রুচির, মনোবৃত্তির, চেতনার প্রকাশ। প্রতি পংক্তি প্রতি পদ অর্থের ও ছন্দের যতি লইয়া নিজে নিজে যথাসম্ভব সম্পূর্ণ হইয়া থাকিতে চেষ্টা করিত। তাহাদের কেহ নিজের সীমানা ছাড়িয়া অপরের সীমানায় প্রবেশ করিতে চাহিত না, তাহাতে যেন বর্ণসঙ্করের আশঙ্কা ছিল। তখনকার যুগের শিল্পীর চেতনায় প্রত্যেক ভাব, প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক বাক্য, প্রত্যেক শব্দ এক-একটি সুষীম, পরিচ্ছিন্ন, গোটা সত্ত্বারূপে আসিয়া দেখা দিত। শিল্পের কারুর কৌশলই ছিল তখন এই পরস্পর হইতে পৃথক বিচ্ছিন্ন ব্যষ্টি-সকলের মধ্যে সাম্য সমন্বয় সঙ্গতি

স্থাপন। সে-যুগের সৌন্দর্য্যের প্রধান কথা ছিল সৌষ্ঠব, অঙ্গে অঙ্গে সঙ্গতি। সমানানুপাত, একটা জ্যামিতিক ক্রমানুগত্য (symmetry, balance)। আধুনিক চেতনায় অনুভবে কিন্তু কোন বস্তুই তাহার বিচ্ছিন্ন স্বকীয়তা লইয়া দাঁড়ায় না—যে সীমানা বস্তুকে বস্তু হইতে এক সময়ে পৃথক করিয়া রাখিত তাহা অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে, মুছিয়া গিয়াছে—কোন বৃত্তি কোন উপলব্ধি আর ভিন্ন নাই, একটির মধ্যে আর-একটি জুড়িয়া মিশিয়া গিয়াছে, সকলের সহিত সকলে ওতপ্রোত হইয়া আছে। মানুষ যেমন দেশ হিসাবে, জাতি হিসাবে, বর্ণ হিসাবে, গোষ্ঠী হিসাবে দিন দিন সকল পৃথকত্ব বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলিতেছে, সমগ্র মানবসমাজে ঘনিষ্ঠতর আদান-প্রদানে একটা উদার সাম্য (হয়ত একাকারও) স্থাপিত হইতেছে, তেমনি মানুষের চেতনায়, অনুভবে ও শিল্পীর রসবোধের মধ্যেও ঘটিয়াছে এই রকম মিশ্রণ সমীকরণ। অঙ্গবিন্যাসে যে মিল, অনুপাতসাম্য, যে সমতুলতা, যে পরিমিতি আগের যুগের সৌন্দর্য্যের মাপ ছিল, তাহার পরিবর্ত্তে বর্ত্তমান যুগে সৌন্দর্য্যে আমরা চাহিতেছি একটা জটিলতর ছন্দের দোল, অনিয়মের ব্যতিক্রমের লীলা।

অতীতে ও আধুনিকে এই যে পার্থক্য,তাহা আমরা বলিতে পারি, হইতেছে melody ও harmonyর পার্থক্য। প্রাচীনের যেন একতারার একতানের গান, অথবা একতারার একতানের সুরের সমাহার বা সঙ্গত—তাহার বৈশিষ্ট্য সুরের বিশুদ্ধি। আধুনিক চাহিতেছে বহুতর বিসদৃশ মিশ্রিত সুরের ঝঙ্কার।

এই দিক দিয়া বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী—বাঙ্গালার সাহিত্য ও বাঙ্গালীর চিত্ত যতখানি আজ আধুনিক হইয়া উঠিয়াছে তাহার সব না হৌক বেশির ভাগ যে একা রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে ঘটিয়াছে এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। মধুসূদন অমিত্রাক্ষরকে আনিলেন, কিন্তু তবু তাহার ছন্দ অক্ষরবৃত্ত। মাত্রাবৃত্তকে ধরিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করিলেন, চলিত করিয়া দিলেন আধুনিকের একটা বৈশিষ্ট্য। কথায়, ছন্দে, ভাবে তিনি আনিয়াছেন মুক্তির, গতির দোল—একটা সমৃদ্ধতর, জটিলতর, উদারতর, সূক্ষ্মতর সামঞ্জস্য—সৌন্দর্য্য। পুরাতনের কবি যখন বলিতেছেন—

কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা॥

কিম্বা বঙ্কিমের ভূয়সী প্রশংসা পাইয়াছে যে—

চলে যান বিবিজান লবেজান করে—

তাহা হইতে কত দূরে আমরা চলিয়া আসিয়াছি যখন শুনি—

"কে এসেছ তুমি ওগো দয়াময়"—
শুধাইল নারী, সন্ন্যাসী কয়—
"আজি রজনীতে হয়েছে সময়—"

অথবা

ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণ-শোণিমা,
মুক্তবেণী বিবসনে, বিকশিত বিশ্ব-বাসনার
অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার
অতি লঘুভার।

ভাবের প্রেরণায় বুদ্ধিকে শাণিত উন্নীত করিয়া, বুদ্ধির সহায়ে ভাবকে বৃহৎ বিচিত্র করিয়া, বাহ্যেন্দ্রিয়কে অন্তরেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে গভীরতর রসায়িত করিয়া, বিভিন্ন স্তরের নানা অনুভবকে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত, সম্মিলিত, সুসম্বদ্ধ করিয়া, সমস্তকে একটা উদার লঘুপক্ষ ছন্দের মধ্যে তরঙ্গিত রূপায়িত করিয়া রবীন্দ্রনাথ যে কল্পলোক রচিয়াছেন তাহার মধ্যে

আধুনিক জগৎ তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাহার স্বপ্ন-উপলব্ধি লইয়া দেখিতে পাইয়াছে নিজের গভীর প্রকৃতির একটা প্রতিরূপ।

আজ বাঙ্গলার রসরচনায়—শুধু রসরচনায় কেন, সাধারণভাবে সমস্ত সাহিত্য-রচনাতেই—যে সামর্থ্য, যে নৈপুণ্য, যে একটা উদাত্ত সুর সহজ স্বাভাবিক এমন কি অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহা রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথম লেখনী ধরিয়াছিলেন তখন কেবল আদর্শের দূর-লক্ষ্যেরই বিষয় ছিল। অর্দ্ধশতাব্দী ব্যাপিয়া রবীন্দ্রনাথ যে সম্পদ পুঞ্জীভূত করিয়াছেন সেই ভাণ্ডার তাঁহার উত্তরাধিকারী আধুনিকেরা আমরা সকলে যথেচ্ছ যথাসামর্থ্য আহরণ করিতেছি, ভোগ করিতেছি—অনেক সময়ে মনে করিতেছি, তাহা বুঝি আমাদেরই নিজস্ব প্রতিভার উপার্জ্জন।

রবীন্দ্রনাথ যে একটা বিপুল উত্তুঙ্গ তরঙ্গ আনিয়া দিয়াছেন, আমরা তাহাতে ভাসিয়া চলিয়াছি; কিন্তু ঢেউএর মাথায় স্থান পাইয়াছি বলিয়া, অনেক সময়ে বুঝিতেই পারি না আমরা কতদূর উঠিয়াছি, আবার অনেক সময় ঢেউএর কথা ভুলিয়া গিয়া মনে করি এই

উন্নয়ন আমাদের ব্যক্তিগত কৃতিত্ব। সাবালক সমৃদ্ধ ভাষার একটা লক্ষণই এই যে, তাহাতে যে-কেহ কিছু রচনা করিতে চেষ্টা করে সে হাতের মধ্যে পায় একটা তৈয়ারী যন্ত্র—যন্ত্র তাহাকে গড়িবার জন্য চেষ্টা করিতে হয় না, তাহার পক্ষে প্রয়োজন কেবল যন্ত্রকে খেলাইবার কৌশল। সে-সাহিত্যের জগতে কোন শিল্পীই একটা বিশেষ ধাপের, সুর-গ্রামের নীচে নামিয়া পড়িতে পারেন না—ভাষার সাহিত্যের এমন একটা শক্তি-সামর্থ্য, এমন কারুগত ধরণ-ধারণ নিজস্ব প্রকৃতিভুক্ত হইয়া যায় যে, তাহাই কারিগরকে চালাইয়া লয়, কারিগর যদিই বা তাহাকে না চালাইতে পারে। অবশ্য বলি না, বাঙ্গলা তাহার সমৃদ্ধির পরিপুষ্টির চরমে পৌঁছিয়াছে; কিন্তু যতখানি সমৃদ্ধি পরিপুষ্টি হইলে বলা যায় পূর্ণযৌবনের আরম্ভ তাহা আনিয়া দিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ। আবার এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ সাক্ষাতে কার্য্যত যতখানি না করিয়াছেন, তাহার বেশি করিয়াছেন ভাবের দিক দিয়া, অসাক্ষাতে একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া।

আমরা আধুনিক কথাটি ব্যবহার করিয়াছি।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, আধুনিক অর্থে অতি-আধুনিকও বুঝিব কি না। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে একটা চির-তারুণ্যের গতি, যৌবনরসে উচ্ছল ছন্দ বহমান, তাহার ধর্ম্মই নিত্য নূতনের দিকে চলা, অভিনবের সাথে পরিচয় স্থাপন করা—সবুজকে সাদরে বরণ করা। সুতরাং আধুনিকতমেরও সহিত তাঁহার একটা সহানুভূতি, একটা সৌহার্দ্দ্য কোথাও থাকাই স্বাভাবিক। তবুও একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে—রবীন্দ্রনাথ হইতেছেন সকলের উপরে রূপের—সুরূপের, আকারগত সৌষ্ঠবের পূজারী। রূপের কাঠামোকে ভাঙ্গিয়া বদলাইয়া যতই তরল, যতই নমনীয় করুন না, তবুও পরিশেষে কাঠামো—একটা সুষীম কাঠামোই—তিনি দিয়াছেন। অতি-আধুনিকেরা কাঠামো বলিয়া কোন জিনিষ আদৌ রাখিয়াছেন কি না সন্দেহ—গঠনকে জলীয়, জলীয় নয়, প্রায় বাষ্পীয় করিয়া তুলিয়াছেন তাঁহারা। মিলের ত' কথাই নাই, সুনিয়মিত তাল ও যতিও তাঁহারা নির্ব্বাসন দিয়াছেন। অলঙ্কার শাস্ত্রের উল্লিখিত সকল রকম দোষ তাঁহারা অঙ্গের ভূষণ করিয়া লইয়াছেন। অবশ্য যদি চাই তবে 'পূরবী'র

দেখো চেয়ে কোন্ উতলা পবন-বেগে
সুরের আঘাত লেগে
মোর সরোবরে জলতল ছলছলি'
এ-পারে ও-পারে করে কী যে বলাবলি
তরঙ্গ উঠে জেগে—

কিম্বা 'বলাকা'র

পর্ব্বত চাহিল হ'তে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ,
তরুশ্রেণী চাহে, পাখা মেলি'
মাটির বন্ধন ফেলি'
ওই শব্দরেখা ধরে' চকিতে হইতে দিশাহারা,
আকাশের খুঁজিতে কিনারা—

হয়ত বলিতে পারি, দিতেছে আধুনিকতমের একটা ছায়া বা আভাস—একটা মোলায়েম মার্জ্জিত মূর্ত্তি। কিন্তু তবু অতি-আধুনিক তাহার গতিবিধিতে দিতে চায় যে একটা বিপর্য্যয়ের প্রলয়ের ওলট-পালটের সুর তাহা এখানে পাই না। মনে হয় এতখানি নবীন, এতখানি আধুনিক হইয়াও দূর অতীতের অন্তরস্থ সত্তার সাথে তাঁহার একটা নাড়ীর সম্বন্ধ রহিয়া গিয়াছে, তাহা তিনি কাটিয়া ফেলিতে চাহেন নাই।

এই একটা নিগূঢ় স্থিতিশীলতাই তাঁহাকে প্রতিমার

পূজারী করিয়া রাখিয়াছে—তাঁহাকে একান্ত বিপ্লবী মূর্ত্তিভঙ্গকারী হইতে দেয় নাই। ফলতঃ রবীন্দ্রনাথের কারু-পদ্ধতির একটা বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি আমরা এখানে আকর্ষণ করিতে পারি—রূপকে কাঠামোকে তিনি অনেক সময়ে লীলাচ্ছলে খুব দৃঢ় বাঁধনেরই মধ্যে রাখিয়া তবে গড়িয়াছেন; অবন্ধনকে মুক্তিকে তারল্যকে অনিশ্চিতকে তিনি খেলাইয়া তুলিয়াছেন কথার চেয়ে বরং ছন্দের মধ্যে, ছন্দের চেয়ে চিন্তার মধ্যে, এবং চিন্তারও চেয়ে বরং ভাবের মধ্যে। রূপগত গঠন—দার্ঢ্যেরই মধ্যে এই প্রকারে একটা অপরূপ কমনীয়তা নমনীয়তা লীলায়িত করিয়া তুলিয়াছেন—শরীরের মধ্যে অশরীরীকে, সীমার মধ্যে অসীমকে স্থাপন করিয়াছেন—অসংখ্য বন্ধনের মাঝে মুক্তির স্বাদ তিনি আমাদিগকে দিয়াছেন। আরও, সকল নৈকট্য ও অবাধ পরিচয় সত্ত্বেও হাবে-ভাবে চলনে-বলনে তাঁহার কবিত্বে সর্ব্বত্রই আছে একটা আভিজাত্য, একটা গরিমা; ইহাও সম্পূর্ণভাবে অতি-আধুনিক হইবার পক্ষে তাঁহার অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

জয়ন্তী-উৎসর্গ (১৩৩৮)

রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিকতা

(দ্বিতীয় পর্য্যায়)

রবীন্দ্রনাথের কল্যাণে বঙ্গসাহিত্য আধুনিক হয়ে উঠেছে এবং বিশ্বসাহিত্যের পদবীতে উন্নীত হয়েছে। রবীন্দ্র-প্রতিভার এই দানবৈশিষ্ট্য আমরা সকলেই বোধ হয় একবাক্যে স্বীকার করি। বঙ্কিমচন্দ্র বা তারও আগে, একেবারে গোড়ায়, রামমোহনে বাঙ্গালীর সাহিত্য-জগতে এই আধুনিকতা ও বিশ্বভাব স্থরু হয়েছিল বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথে এ দুটি ধারা যেমন উপচিত সমৃদ্ধ ও বিচিত্রগতি হয়ে উঠেছে তা দেখে এই উপমাটি মনে হয় যে তাঁর পূর্ব্বে বঙ্গবাণী ছিল যেন—কালিদাসের ভাষায়—'বেণীভূত প্রতন্বুসলিলা', আর তাঁর পরে সে হয়ে উঠেছে উভয়কূলপরিপ্লাবী ফেনিল ঊর্ম্মিল সাগরসঙ্গম।

সে যা হোক, এখানে রবীন্দ্রনাথের এ দিকটির পরিচয় দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। আজ আধুনিকতার (ও বিশ্বমানবতার) প্রবাহ এত দূর চলে গিয়েছে, এত

সর্ব্বগ্রাসী হয়ে উঠেছে যে তা প্রায় অতিমাত্রার ও বিকৃতির পর্য্যায়ে উঠেছে গিঁয়ে। এখন সময় ও অবস্থা এসেছে যখন মনে হয় দৃঢ় উদাত্ত কণ্ঠে বলা প্রয়োজন হয়েছে—'এবার ফিরাও মোরে'; বর্ত্তমানের, দারুণ আধুনিকতার উপপ্লব ও পরিপ্লাবন থেকে প্রাচীনের, সনাতনের দুই-একটা মহাসত্য, সমুচ্চ উপলব্ধি রক্ষা করা আজ আশু কর্ত্তব্য হয়ে উঠেছে। আমি তাই বলতে চাই রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট পরিমাণে আধুনিক ও বিশ্ববাসী হলেও তাঁর মধ্যে অক্ষুণ্ণ রয়েছে, মূর্ত্তি পেয়েছে প্রাচীনের ও দেশীয়ের অন্তঃস্থ কয়েকটি সনাতন চিরন্তন সত্য ও উপলব্ধি।

কি তবে সেই বাঞ্ছনীয় পুরাতন ও সনাতন সত্য? সেগুলি পুরাতন ও সনাতন স্বতঃসিদ্ধ। মানুষের আবির্ভাবের সঙ্গেই বোধ হয় তাদের জন্ম হয়েছে; যুগে যুগে দেশে দেশে তারা মানুষের গভীরতম নিবিড়তম উচ্চতম প্রিয়তম আশা ও আকাঙ্ক্ষার বস্তু। ভগবান্-ঈশ্বর-পরমাত্মা, সত্য-ঋত-বৃহৎ, আনন্দ-অমৃত, চৈতন্য-আনন্ত্য, উত্তম জ্যোতি, পরা শান্তি—এইসব অতিপরিচিত জিনিষগুলিরই কথা আমি বলছি। এই

যত অপার্থিব অতীন্দ্রিয় অব্যবহার্য্য জিনিষ এরাই মানুষের চেতনায়, তার যাবতীয় সৃষ্টির মধ্যে কি পিছনে, প্রকট কি প্রচ্ছন্ন রয়েছে—এরাই গড়েছে মানুষের সূত্রাত্মা যাকে আশ্রয় ধরে চলেছে তার জীবনলীলা, তাতেই প্রোত রয়েছে তার প্রকৃতির সকল রূপায়ন—মণিগণাইব। এইসব প্রাচীন সত্যই তাদের পূর্ণ সুষমা ও প্রভায় রবীন্দ্রনাথে পরিস্ফুট, তিনি তাদের সচেতন ও একনিষ্ঠ পূজারী। বর্ত্তমানের মানবচেতনা যুগধর্ম্মবশতঃ যেন এই সকল প্রাচীন পুরাতন সম্পদ অগ্রাহ্য করে চলতে চায়, মায়া মতিভ্রম বলে ঘোষণা করে। কেহ বা এদের গণনার মধ্যেই আনে না, সম্পূর্ণ উদাসীন এদের প্রতি ; কেহ বা এদের উপর বিশেষ জোর দেয়, বিরোধী বিপজ্জনক মানুষের শত্রু বলে। তবে উভয়েরই লক্ষ্য ঐহিক লৌকিক স্থূল সামগ্রী ও ঐশ্বর্য্য, তারা চায় 'ইদং'এর, 'প্রেয়ে'র উপাসনা। এ ধারা সম্প্রতি আবার এত স্ফীত ও দুর্ব্বার হয়ে উঠেছে যে মানবজাতির সমগ্র চেতনাকে অভিভূত করে গ্রাস করে ফেলবার উপক্রম করেছে। বর্ত্তমানের কবি ও স্রষ্টা—আধুনিক নামে যাঁরা

নিজেদের অভিহিত করতে চান তাঁরা—জোর গলায় স্পষ্টই জানাচ্ছেন : 'আমরা আকাশের পূজারী নই, আমরা ধূলির সেবাইত—আত্মার নয় রক্তমাংসের, অনন্তের নয় ক্ষণিকের, আনন্দের অমৃতের নয় তীব্র বেদনার ও মৃত্যুর নবী ও কবি।'

কেবল লক্ষ্যের দিক দিয়ে নয় উপায়ের দিক দিয়েও, বস্তুর দিক দিয়ে নয় রীতির দিক দিয়েও এসেছে অনুরূপ পরিবর্ত্তন ও বিপর্য্যয়। স্বভাবের মেজাজের ধারায় দেখা দিয়েছে এক বৃহৎ বৈরূপ্য ও বৈপরীত্য। প্রাচীন জীবনের ও শিল্পের ধারা ও ধরণ অর্থ আভিজাত্য —মহত্ত্ব, গুরুত্ব (ম্যাথু আর্নল্ডের high seriousness স্মরণ করা যেতে পারে), সংযম সামঞ্জস্য সৌষীম্য, শ্রী ও হ্রী। প্রাচীনের চলনে বলনে এই গুণগুলি ফুটে উঠেছে, এদের ছাড়া তার সৃষ্টি নাই। ইউরোপের শিক্ষা-দীক্ষা-সভ্যতার বনিয়াদ যে গ্রীকো-লাতিন প্রতিভা তা ঠিক এই রীতিকে একান্ত করে গ্রহণ করেছিল। বর্ত্তমান যুগে আমরা ওসব বদলে দিয়েছি —আভিজাত্য, শ্রী, হ্রীর বালাই আমাদের নাই। হেলেনিক দেবতাকে ত বিসর্জ্জন দিয়েছিই, হেব্রায়িক

দেবতাও আর আমাদের ইষ্ট হতে পারছেন না—আমরা এখন নর্ডিক (Nordic) দেবতার, থর ও ওডিনের পূজারী।

ফলতঃ মনে হয় গ্রীকো-রোমক জগতের পতন-কালে যে অবস্থা হয়েছিল, বর্ত্তমান যুগে ঠিক সেই রকমই এক অবস্থা এসে দাঁড়িয়েছে। ইউরোপের উত্তরাপথ হতে বর্ব্বরবাহিনী রোমক সাম্রাজ্যের উপর যখন প্রলয়পয়োধিজলরাশির মত এসে ভেঙ্গে পড়ল, তাতে ধ্বসে গেল ভেসে গেল প্রাচীনের শিক্ষাদীক্ষা। গ্রীকো-রোমক আদর্শ মানুষকে দিয়েছিল যে একটা বিশিষ্ট শোভন সুচারু গড়ন, তার পরিবর্ত্তে এসে পড়ল সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলা, অশোভনতা, রূঢ়তা—চেতনার ক্ষীণতর দীনতর পরিম্লায়মান দ্যুতি। আভিজাত্যের পরিবর্ত্তে দেখা দিল সাধারণ্যের জনতার ধর্ম্ম—অর্থাৎ চপলতা চঞ্চলতা মুখরতা স্থূলতা ব্যামিশ্রতা, সংযমের দার্ঢ্যের আত্মস্থতার সম্পূর্ণ বিলয়—তলা থেকে একটা অজ্ঞানের তামসিকতার আবির্ভাব, যার চাপে সর্ব্বগঠন ক্রমে ফেটে ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে থাকে। এই ভাবেই সমাজ উৎসন্নে যায়। এ কথা ঠিক গ্রীকো-

রোমক শিক্ষাদীক্ষা ভেসে গেল বিনষ্ট হল বটে, কিন্তু তার পরে ফলে এল নূতন অভিনব আধুনিক (অপেক্ষাকৃত) সংস্কৃতি। কিন্তু প্রথম কথা, সে নবসৃষ্টির জন্য প্রয়োজন হয়েছিল কয়েক শতাব্দী—বিপ্লবের ভাঙনের জের শেষ হতে, তার ভোগকাল সমাপ্ত হতে—তার পর, নূতনের যখন গোড়াপত্তন হল এবং সত্যকারের সৃষ্টি সুরু হল তখনও আবার সেই পুরাতন গুণ বা ধর্ম্মেরই কাছে যেতে হল, যতই নূতন ভাবে, ভোল পরিবর্ত্তন করে হোক। রোমান্স ভাষা ও সাহিত্য গড়ে উঠল রূপ গ্রহণ করল মানুষ যখন আবার ফিরে অর্জ্জন করল একটা অন্তরের আভিজাত্য, চলনে বলনে একটা শ্রী ও হ্রী।

আধুনিক সর্ব্বতোমুখী ভাঙনের কল্লোল-কোলাহলের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে দেখি অটল পর্ব্বতের মত দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তার উদাত্ত কণ্ঠে ধ্বনিত তবু প্রাচীনের পুরাতনের শ্রীময়ী হ্রীময়ী বাণী—পুরাণী প্রজ্ঞা। আধুনিককে আধুনিক করে তুলতে তাঁর মত বোধ হয় আর কেউ পারে নাই, অর্থাৎ আধুনিকের অন্তরাত্মার দ্যুতি দিয়ে আধুনিককে গঠন করতে তিনি

কথায় ও কাজে শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু আধুনিক যখন হয়ে পড়ল আধুনিকের চর্ম্ম বা খোলসের একটা রঙ ঢঙকে অতিরিক্ত করে তোলা, তখন তাতে তাঁর সায় আর মিলল না। তখন তিনি উপনিষদবার্ত্তার নবী।

২

আধুনিকতার এক বৈশিষ্ট্য সার্ব্বজনীনতা। বহুল শিক্ষাদীক্ষা, বিভিন্ন দেশকালগত বিচিত্র চিন্তাধারা বর্ত্তমান মানুষের চিত্তে যুগপৎ অধিষ্ঠিত, সংমিশ্রিত, এতখানি ও এত রকম ভঙ্গীতে—ইদৃক্‌তয়ারূপমিয়ত্তয়া বা—যে তার তুলনা অন্য কোন যুগে আর পাওয়া যায় না। এ সার্ব্বজনীনতা, গীতোক্ত বর্ণসঙ্করের মত, হয়ে পড়েছে বলা যেতে পারে 'সংস্কৃতিসঙ্কর'। আধুনিক দুই-একজন কবি সজ্ঞানে এই আদর্শের রীতির চর্চ্চা করেছেন, ফুলিয়ে ফলিয়ে দেখিয়েছেন। এজরা পাউণ্ড তাঁর কবিতায়—গুরুগম্ভীর কবিতারই মধ্যে—ইংরেজি বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে ইতালীয়, গ্রীক, লাতিন লাইনকে লাইন পর্য্যন্ত ঢুকিয়ে দিয়েছেন; এলিয়ট সংস্কৃতের দ্বারস্থ পর্য্যন্ত হয়েছেন; জয়েস ত এক রকম সার্ব্বজনীন ভাষাই (composite ও cosmopolitan) সৃষ্টি করেছেন। দেশে দেশে বা অতীতে বর্ত্তমানে একটা বিনিময় বা সংমিশ্রণ ন্যূনাধিক পরিমাণে সর্ব্বদাই আছে। বিদেশীয় ঐশ্বর্য্য আমদানি করা

কবিদের (এক গ্রাম্য বা লোক-কবি ছাড়া হয়ত) একটা স্বধর্ম্ম বললেই চলে। মিলতন ইংরেজি ভাষায় সমগ্র লাতিন ভাষাকে সাহিত্যকে প্রায় অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন, ফরাসী ভাষায় রঁসার অনুপ্রবেশ করান গ্রীক ও ইতালীয় কাব্যের ও ভাষার রঙ ও ঢঙ। প্রাচীন কালে এ রকম ছিল, আধুনিক কালের ত কথাই হতে পারে না; আধুনিক কালে সমস্ত জগৎ ও মানবজাতি যখন সহজ অবাধ ক্ষিপ্র গতায়াতের কল্যাণে এতখানি সংহত ও সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছে (কাল হিসাবেও, অতীতে নানা শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গে আমরা এত ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপন করেছি) যে এ ধরণের আদানপ্রদান ও সংমিশ্রণ বা 'সঙ্কর' অনিবার্য্য, স্বাভাবিক। তবু কথা আছে।

সর্ব্বজন যেমন সত্য, বিশেষজনও তেমনি সত্য। সমষ্টির সঙ্গে ব্যষ্টি ও গোষ্ঠী সমানভাবে সত্য বা বাস্তব। বিশ্বমানবতা রয়েছে, কিন্তু প্রত্যেক দেশের জাতির ভাষার যে পৃথক্ বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য আছে তা অগ্রাহ্য করবার নয়—শুধু তাই নয় জীবন্ত সৃষ্টির জন্য এ জিনিষটির উপর প্রতিষ্ঠা অবশ্য প্রয়োজন। এসব কথা এতখানি বলবার উদ্দেশ্য এই যে, রবীন্দ্রনাথের

প্রতিভা সেই সন্ধিস্থল, সেই মাধ্যমিক স্থিতি—golden mean—আবিষ্কার করতে পেরেছে—বিনা আয়াসে, অবহেলায়, স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্বাভাবিক প্রেরণার বশে—যেখানে মানবচেতনার এই দুটি প্রান্ত অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গসাহিত্যকে কতখানি আধুনিক ও বিশ্বজনীন করে তুলেছেন—এই দিক দিয়ে তাঁর সৃষ্টিকে বিচার বিশ্লেষ করে অনেকে এক সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে রায় দিয়েছিলেন ; গোঁড়া গৌড়ীয়পন্থীরা তাঁকে বাংলায় ফেরঙ্গ-সাহিত্যের প্রবর্ত্তক বলে বিবেচনা করতেন। অবশ্য ইউরোপীয় হাবভাব রবীন্দ্রসাহিত্যে রয়েছে রাশি রাশি—চিন্তা বা বিচারগত সিদ্ধান্ত ছাড়াও তিনি তাঁর অনুভব উপলব্ধির যে রূপাবলী সৃষ্টি করেছেন, তিনি যে একটা জগৎ (বা mythology) রচনা করেছেন তার উপাদান অনেক পরিমাণে এসেছে ইউরোপীয় শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কৃতি হতে। কিন্তু জাতীয় প্রতিভার সঙ্গে তিনি এ সকল এমন মিলিয়ে একীভূত করে ধরেছেন যে তাদের পরদেশী পরধর্ম্মী বলে আর অনুভব হয় না, তাদের পৃথক্ করে আবিষ্কার করাও সব সময় সহজ

হয় না। বিশ্বমানবের বা বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে সমচিত্ত হয়েও বঙ্গীয় বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে অটুট রয়েছে—বঙ্গীয় কবিপ্রতিভার কেন্দ্রকে ধরেই তাঁর কাব্যসৃষ্টির পরিধি বিস্তৃত—সে পরিধি যত দূরেই চলে যাক না, সেই অন্তঃপুরুষের কেন্দ্রই সেই পরিধিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

বাংলার সাহিত্যে বা রসসৃষ্টিতে আজকাল উৎকেন্দ্রতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় এবং তার মাত্রা দিন দিন বর্দ্ধিত হয়ে, ভয়াবহ হয়ে উঠছে। ইংরেজের ইউরোপের শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে প্রথম সংস্পর্শের যুগে আমাদের জীবনে ও সাহিত্যে যে একটা উন্মাদকতা ও উৎকেন্দ্রতা দেখা দিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই তা একটা শান্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ সুষ্ঠু পরিণতি লাভ করে। আজ আবার আরও গভীরতর ব্যাপকতর এক উন্মাদকতা ও উৎকেন্দ্রতা দেখা দিয়াছে। সকল মানুষ, যাবতীয় জনসঙ্ঘ, বিবিধ শিক্ষাদীক্ষাকে আমরা আলিঙ্গন দিতে উন্মুখ ও ব্যাকুল। আধুনিকেরা এই একটি আদর্শের রীতির ঢঙের একমুখী ধারায় চলবার ঝোঁকে ভুলে গেছেন বিশেষ ভাষা সাহিত্য শিক্ষাদীক্ষার যে অন্তঃপুরুষ তার স্থিতির কথা। এ বস্তুটি অতি সূক্ষ্ম,

সন্দেহ নাই, এর পরিধি যে কোথায় কত দূরে গিয়ে থামতে পারে তার নিয়মও কিছু নাই। তবুও সীমা ও সীমানা একটা আছেই—যার এদিকের সৃষ্টি হল জীবন্ত স্বাভাবিক, অপর দিকে তা কৃত্রিম অনুকরণ মাত্র। রবীন্দ্রনাথে একটা গভীর রসবোধ, একটা সূক্ষ্ম মাত্রাজ্ঞান এই সীমা ও সীমানার অব্যর্থ সন্ধান অতি সহজেই দিতে পেরেছে। এক বিশ্বমুখী বিশ্ব-প্রেমময় প্রেরণা তাঁর অন্তরাত্মার পরিধিকে প্রসারিত করে করে বহু দূরে চলে গিয়েছে, যত দূর সম্ভব, অথচ অন্তরাত্মার সূত্রকে কেটে উধাও হয়ে যায় নাই। তাঁর কবিচিত্ত বৈদিক ঋষির মতনই বলছে যেন—

> যত্তে বিশ্বমিদং জগন্মনো জগাম দূরকম্।
> তত্ত আবর্ত্তয়ামসীহ—*

তোমার যে মন এই সারা বিশ্বের মধ্যে সুদূরের পারে চলে গিয়েছে, তাকে আমরা এই এখানে আবার ফিরিয়ে এনেছি।

নূতন যুগে নূতন জগতে নূতন সৃষ্টির অবসর ও প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু এমন কতকগুলি

* ঋগ্বেদ, ১০-৫৮-১০

সত্য আছে যা চিরন্তন সনাতন, নূতনের মোহে তাদের অবজ্ঞা করা ও প্রত্যাখ্যান করা অর্থ জীবনের সৃষ্টির মূল উচ্ছেদ করা। অতীত জগতের শ্রী ও হ্রীর কথা বলেছি—তারা হল সর্ব্বাঙ্গসুষ্ঠু সম্যক্‌সৃষ্টিব আবহাওয়া। শ্রী ও হ্রীর অর্থ ই হল মাত্রাবোধ। বর্ত্তমান যুগে ঠিক এই দুটি জিনিষকেই আমরা বিসর্জ্জন দিয়ে ফেলেছি—জীবনে ও শিল্পরচনায় (স্মরণ করা যায় 'দাদা' Dada-তন্ত্রীদের কথা)। কিন্তু ফিরে ও-দুটির আশ্রয়ে আসতেই হবে—যদি সত্যকার সৃষ্টি কিছু আমাদের প্রয়াসের লক্ষ্য হয়। রবীন্দ্রনাথ আর কিছু হন বা না-হন তিনি শ্রী ও হ্রীর জাগ্রত জ্বলন্ত বিগ্রহ।

শ্রী ও হ্রী আবার যখন একটা অবয়ব গ্রহণ করে, অনন্তের অসীমের প্রভাও যদি তার মধ্যে স্ফুট হয় তবুও, তখন তাকে একটা দেশকালপাত্রের মধ্যে সসীম বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করতে হয়। এই বিশিষ্ট আকারের সুষীম সৌন্দর্য্য, রূপনৈপুণ্য সৃষ্টির ও শিল্পের এক চিরন্তন সত্য। ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বময় সর্ব্বাতীত হলেও যেমন আবার মানুষী তনু গ্রহণ করেন—সেই রকম। একত্ব সত্য বটে, কিন্তু একাকার নয়।

আমাদের আজকালের চেতনা বহুমুখী বহুল হয়ে গিয়েছে, একত্বকে রক্ষা করতে পারে নাই। যে একত্ব একাকার নয় অথচ বহুলকে সুষীমতা দিয়ে ধারণ করেছে তার নাম ঐক্য।

রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানের দিক দিয়ে হয়ত বৈদান্তিক কিন্তু অনুভবের, চিত্তরাগের, রসবৈদগ্ধ্যের দিক দিয়ে হলেন—বলা যেতে পারে pagan—মূর্ত্তি-উপাসক। তাঁর অন্তশ্চেতনার এই ভাবটিই তাঁকে অতিমাত্রা থেকে রক্ষা করেছে—যতই তিনি গতিপন্থী হোন না, চঞ্চলের মধ্যে স্থাণু যে বস্তু, তার সঙ্গে তাঁর নিত্য সংযোগ বজায় রেখেছে।

প্রবাসী, ১৩৪৮

রবীন্দ্রনাথের ভাষা

বাংলা ভাষা যদি জগতের ভাষা হয়ে থাকে, অর্থাৎ তার প্রাদেশিক উপভাষাগত গড়ন-চলন অতিক্রম করে যদি বিশ্বের মুখ্য কয়টি ভাষার মধ্যে স্থান পেয়ে থাকে, তবে তার মূলে রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। আজ আমাদের হাতে ভাষাটির ঐশ্বর্য্য এত সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে যে আমরা হঠাৎ হৃদয়ঙ্গম করতে পারি না যে রবীন্দ্রনাথের অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী অফুরন্ত বিপুল সৃষ্টির পূর্ব্বে তার ঠিক সে রূপ বা অবস্থা ছিল না। আমি সাহিত্যের কথা বলছি না, আমি বলছি কেবল ভাষার শব্দসম্ভারের, বাক্যের, বাক্যগঠনের, ছন্দোবন্ধের বৈচিত্র্যের কথা। ভাষার সামর্থ্যের পরিচয় তার প্রকাশ ক্ষমতায়—কত বিভিন্ন রকমেব কথা সে ব্যক্ত করতে পারে এবং কত যথাযথভাবে, তার উপরে। বাংলার ক্রমোন্নতিধারায় বঙ্কিমচন্দ্র একটি প্রধান ও গোড়াকার পৈঠা। কিন্তু বঙ্কিমের সময়ে বঙ্গভাষার ছিল কৈশোর মাত্র—অত্যধিক পক্ষে, প্রথম যৌবন—তার গঠন তার গতিবিধি ছিল অনেকখানি সঙ্কীর্ণ, পরীক্ষামূলক,

অনিশ্চয়তাসঙ্কুল। রবীন্দ্রনাথই সেখানে এনে দিয়েছেন পূর্ণ যৌবন, পরিণত সামর্থ্য, নিঃসন্দেহতা, বহুল বিচিত্র প্রতিভা। বঙ্গভাষার বৃদ্ধি ও বিকাশের এখনও শেষ হয় নি, এখনও সে কাজ সমান জোরে চলেছে, তাই প্রৌঢ়তার সুপরিপক্কতার কথা বললাম না। বঙ্কিমের যুগ অবধি ইউরোপীয় বা আধুনিক ভাবভঙ্গীর প্রকাশ বাংলায় অনেকখানি দুষ্কর ছিল, তাতে থেকে যেত একটা কষ্টকল্পনা, আড়ষ্টতা (উদাহরণ, অক্ষয়কুমার দত্তের 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার')। বঙ্কিমচন্দ্রই এ ধারাটি সহজ সুগম করে তোলবার সূত্র ধরে দিয়েছিলেন—তবে তা'ও কেবল সূত্রপাত। কিন্তু আজকাল? ইউরোপ-আমেরিকার ত কথাই নাই, ফিনলণ্ড-গ্রীণলণ্ড কি বাসুটো-জুলুর কথা অথবা সুপ্রাচীন মিশর-বাবিলনের কথা পর্য্যন্ত সহজে ও সম্যক প্রকাশ করবার ক্ষমতা বাংলার হয়েছে। এই যে বিপুল পরিবর্ত্তন বা বিবর্ত্তন তার প্রধান হেতু রবীন্দ্রনাথের প্রায় অঘটনঘটনপটীয়সী বাক্‌প্রতিভা—সাক্ষাৎভাবে এবং তার বেশী অসাক্ষাৎভাবে, অর্থাৎ অদৃশ্য প্রভাবে সে প্রতিভা এ কাজটি করে তুলেছে।

রবীন্দ্রনাথ কত যে নূতন শব্দ সৃষ্টি করেছেন, তার একটি তালিকা প্রস্তুত করলে খুবই শিক্ষাপ্রদ হয়। পুরাতন অর্থাৎ অভিধানগত কত শব্দ তিনি সচল সজীব নিত্যনৈমিত্তিক করে দিয়েছেন, আবার কেবলমাত্র মৌখিক উপভাষার কত শব্দ তিনি সাহিত্যিক পদবীতে উন্নীত করে ধরেছেন তার পরিমাণ কম নয়। তা ছাড়া, রবীন্দ্রনাথের শব্দচয়নে এক বিশেষত্ব আছে—তাতে তাঁর সৃষ্টিপ্রতিভার স্বরূপটি ফুটে উঠেছে। প্রথমত, তাঁর শব্দ সব মনে হয় যেন বাংলার প্রাণ হতে মর্ম্ম হতে উৎসারিত—পণ্ডিতের বৈয়াকরণিকের নির্ম্মিত নির্ভুল সাধু বর্ণসমষ্টির জড়ত্ব সেখানে নাই, অন্য দিকে আবার নাই তাতে সকল বিধিনিষেধ-বিরোধী খামখেয়ালীর উদ্ভটতা বা কৃত্রিমতা—এমন স্বাভাবিক সরল, ভাষার স্বধর্ম্মের গড়ন-চলনের সঙ্গে এমন তারা মিলেমিশে খাপ খেয়ে যায়। দ্বিতীয় হল, শব্দের সুষমা ও লালিত্য। শব্দের সহজ প্রকাশ-সামর্থ্য থাকা চাই—তার হওয়া চাই সজীব প্রাণবন্ত —আরও হওয়া চাই সুন্দর ও মধুর। রবীন্দ্রনাথের শব্দকোষে এই তিনটি গুণই পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান। অন্য দিকে, তাঁর ভাষায়

অসুন্দর, নির্জীব, আড়ষ্ট, দুর্ব্বল, কর্কশ, শ্রুতিকঠোর বলে কিছু নাই—সত্যই তাঁর ভাষা সর্ব্বতোভাবে শ্রীময়ী, লক্ষ্মীময়ী তিলোত্তমা—

সৌম্যা সৌম্যতরাশেষসৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী।

রবীন্দ্রনাথের বাক্‌দেবী সুন্দরের সুষীমতার পারিপাট্যের পরাকাষ্ঠা। বঙ্কিমের ভাষাও সুন্দর ও শ্রীময়—তা পুরুষালী নয়, তাও রমণীয় তবে তাতে রবীন্দ্রনাথের মত এতখানি রমণীয়তা মধুরতা, লালিত্য কমনীয়তা নাই। তা ছাড়া প্রাচুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যও রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব। বঙ্কিম সরল শোভন এবং স্বচ্ছ—তাতে রয়েছে যাকে বলে ক্লাসিকের শালীনতা সংযম স্থিরতা ও স্পষ্টতা। বঙ্কিম স্মরণ করিয়ে দেন ফরাসী ভাষার কথা—রাসীন বা ভলতেয়ারের ফরাসী ভাষা। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিতে, আবহাওয়ায় পাই রোমান্টিকের চিত্তস্ফূর্ত্তি—তাই তাঁর ভঙ্গির লক্ষণ ঋজুতা ততখানি নয় যতখানি কারুতা, স্বচ্ছতা ততখানি নয় যতখানি বর্ণবিলাস, সারল্য নয় সালঙ্কারিতা। চিন্তার ভাবের অনুভাবের কত রকমারি গমক প্রতিধ্বনি তাঁর ভাষা স্ফুলিঙ্গের মত প্রতি পদে চারিদিকে ছড়িয়ে চলেছে।

ব্যঞ্জনাব সূক্ষ্মতা, বক্রোক্তির রেশ, চলনের লীলায়িত সৌকুমার্য্য আমাদিগকে আর-এক জগতের দুয়ারে প্রতিনিয়ত নিয়ে চলে। প্রত্যক্ষের বিচারবিতর্কের, যুক্তির যে ধারা ও ধরণ তাতে ববীন্দ্রনাথের রচনারীতি গঠিত বা নিয়ন্ত্রিত হয় নি। স্পর্শালু চিত্তের, তীব্র বোধশক্তির, নিবিড় উন্মুখী আদর্শপ্রিয়তার যে সহজাত বিবেক বা আকর্ষণ-বিকর্ষণ তা'ই দিয়েছে তাঁর ভাষার গড়ন ও গতি। তর্কবুদ্ধি বা যুক্তি এখানে তার পৃথক স্বাতন্ত্র্য নিয়ে দাঁড়ায় নি—সে জিনিয এক সবস প্রাণের অপরোক্ষ অনুভবের যেন পরোক্ষ স্ফুরণ। দৃঢ়গ্রন্থি, গাঢ়বন্ধ, প্রশান্ত প্রসন্ন হওয়ার অবকাশ বা প্রয়োজন এ ভাষার তেমন নাই—তার প্রয়োজন আবেগ, বেগ, ধার—এ যেন রবীন্দ্রনাথের নিজেরই সুরসভাতলে নৃত্য করে চলে যে বিলোলহিল্লোল উর্ব্বশী তারই পায়ের ছন্দ।

কিন্তু তাই বলে উচ্ছ্বসিত, কেবলই ভাবাবেগ-ফেনিল এ ভাষা নয়—এখানেও আছে বাঁধন, সংযম; বাঁধন সংযম ছাড়া ভাষার পারিপাট্য সৌষ্ঠব কখনও আসতে পারে না। তবে সে বাঁধন এখানে নির্ভর করে লীলায়িত গতির আপন ছন্দের উপর—তার যতি, তার

নিজস্ব পদক্ষেপের মাপের উপর। ক্লাসিক-রীতিতে প্রতিফলিত বুদ্ধির স্বচ্ছতা, যুক্তির বাঁধন ও দৃঢ়তা, প্রমাণ-ক্রমের নিরাভরণতা (যথা, ম্যাথু আর্নল্ড), কিন্তু আমাদের কবির রচনায়, কবির গদ্য রচনাতেও দেখা দেয়, বুদ্ধির লজিক হয়ত নয়, কিন্তু অনুভবের লজিক—এ লজিক আরও জীবন্ত সচল।

বাংলার তৃতীয় যে ভাষা-শিল্পী—আমি বলছি শরৎচন্দ্রের কথা—তাঁর সঙ্গে ববীন্দ্রনাথেব বৈরূপ্য আমরা এখানে লক্ষ্য করিতে পারি। শরৎচন্দ্রের ভাষা বঙ্কিমের মতই ঋজু স্বচ্ছ সরল—তবে বঙ্কিম সব সময়ে মণ্ডন অলঙ্কার অপছন্দ করেন না—কিন্তু শরৎচন্দ্র একান্ত নিরাভরণ। কিন্তু এই নিরাভরণতার হেতু তাঁর যুক্তিতন্ত্রতা নয়—হেতু, তিনি দৈনন্দিন ভাষা, সাধারণের ভাষা, সকলের সহজ মুখের ভাষার ছাঁচে ঢেলে তাঁর ভাষা গড়েছেন, তবে তাকে মেজে ঘষে পরিষ্কার করে ঝরঝরে তক্তকে করে নিয়েছেন। স্পষ্টতা ঋজুতা সত্ত্বেও বঙ্কিমের হল গুণীজনের ভাষা—নাগরিক বা পৌর ভাষা ; শরৎচন্দ্রের বলা যেতে পারে 'গ্রামিক' (গ্রাম্য বলা দোষ হবে) বা জানপদ ভাষা।

তবে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাদৃশ্য এইখানে যে উভয়ের ভাষাই গতিমান, এমন কি খর গতিমান, বেগময়, এমন কি তীব্র বেগময়। যদিও গতির ভঙ্গিতে বৈসাদৃশ্য রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষা দ্রুত চলেছে বটে কিন্তু এঁকেবেঁকে, এদিক-সেদিক ঘুরেফিরে, আশেপাশে দেখে শুনে, অফুরন্ত মন্তব্য বক্তব্য প্রকাশ করতে করতে, কৌতূহলের ঝলক ছড়াতে ছড়াতে—তাতে ফুটে উঠেছে আল্‌পনার লীলায়িত রেখাবলী। শরৎচন্দ্র চলেন সোজা তাঁর লক্ষ্যে—জ্যামিতিক সরল রেখায় হয়ত নয়—তাঁর পথ ঈষৎ বক্র—বৃত্তাভাস—তীরমার্গের মত। এবং এ বক্রতা এসেছে আবেগের অন্তর্মুখী গাঢ়তা ও তীব্রতার চাপে। দামাস্কাস ইস্পাতের মত তা শাণিত ক্ষুরধার, নমনীয় অথচ সুদৃঢ়। বলা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের গতি হল ঝরণার—বহুল ধ্বনিতে বিচিত্র বর্ণে তা সমৃদ্ধ। শরৎচন্দ্রের হল নিঃশব্দে আকাশচারী লঘুপক্ষ পাখীর গতি। বঙ্কিমের মধ্যে আমরা পাই প্রশান্ত প্রসাদগুণ, পরিচ্ছিন্ন পারিপাট্য—রবীন্দ্রনাথে কারু-কার্য্যবলয়িত বৈদগ্ধ্য—শরৎচন্দ্রে সবেগ সারল্য।

রবীন্দ্রনাথের অলঙ্কারিতার কথা আমি বলছি। কিন্তু মনে রাখতে হবে এ অলঙ্কার স্থূল ভূষণ আদৌ নয়। দ্রাবিড়ী প্রসাধনের গুরুভার এখানে অণুমাত্র নাই—আধুনিক গহনার মত তা হালকা পাতলা; সোনার তার পিটিয়ে অতি সরু করে তবে তা দিয়ে যেন বহুভঙ্গ লতাপাতা কাটা হয়েছে—এ কারুতা হল চারুতা। কারণ তার কাজ সূক্ষ্ম মিহি চিক্কণ, তাতে বাহ্য আড়ম্বর, স্থূল হস্তের অবলেপ নাই—অঙ্গে অঙ্গে তার রয়েছে সৌকুমার্য্য, বলয়িত লাস্য।

আজ বাংলা ভাষা নিত্য নূতন সৃষ্টির জন্য উন্মুখী উদ্ব্যগ্র। অনেক নব সেবকের হাতে সে যে উন্মার্গগামী হয়ে পড়বে, তাও স্বাভাবিক। এদিক দিয়ে রবীন্দ্র-নাথের উদাহরণটি সম্মুখে ও স্মরণে রাখা একান্ত প্রয়োজন—তাঁর অনুকরণ বা অনুসরণ করবার প্রবৃত্তি যদি না-ই থাকে। রবীন্দ্রনাথও বহু নবসৃষ্টি করেছেন—এমন কি অতি-আধুনিক ধারাতেও নেমে গিয়েছেন, কিন্তু তাঁর বৈশিষ্ট্য ও শক্তি এইখানে যে তিনি কখন যথাযোগ্যের, সুন্দরের সীমানা অতিক্রম করে যান নি—পরন্তু যেখানেই বা যত দূরই গিয়ে থাকুন সে

সমস্ত সুন্দরেরই এলাকাভুক্ত করে নিয়েছেন। শ্রীহীনতা নিরর্থকতা তাঁর কোন প্রয়াসে এসে দেখা দেয় নি। নূতনের অভিনবের ধারায় চলে তিনি সর্ব্বত্র সুন্দরের সৌষ্ঠবের সার্থকতারই প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন। তাঁর অন্তরাত্মাকেই তিনি প্রকাশ করে ধরেছেন।

প্রবাসী, ১৩৪৩

দূরের যাত্রী রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথে—তাঁর জীবনে, তাঁর শিল্পসৃষ্টিতে, বিশেষ-ভাবে তাঁর কাব্যে—রূপ নিয়েছে যে জিনিষটি তা হল আমরা যাকে বলি আস্পৃহা, অভীপ্সা—অন্তঃপুরুষের নিভৃত এক ঊর্দ্ধমুখী আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা। সাধারণের মোটা ভাষায় তাকে বলা যায় ভগবানের দিকে টান, দার্শনিকের পরিভাষায় তার নাম আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কবি, রবীন্দ্রনাথ আধুনিক—এই প্রাচীনতর নামরূপ বা সংজ্ঞার ছাঁচে তাঁকে হুবহু ঢালা যাবে না। ফলতঃ তাঁর চেতনার গুণবৈশিষ্ট্যই হল লক্ষ্যকে আদর্শকে গন্তব্যকে ইষ্টকে যথাসম্ভব অপরিচ্ছিন্ন অনির্ব্বচনীয় করে রাখা। নির্দ্দিষ্ট স্পষ্ট করে ধরা অর্থ সীমাবদ্ধ করা, স্থূল ও স্থাণু করে তোলা। তাই যে বস্তুর উপাসক পূজারী প্রেমিক তিনি তার নামকরণ করতে গিয়ে ভাষায় যে কথা যত ব্যাপক যত অবিশেষ ও অস্পষ্ট সেগুলি ব্যবহার করেছেন—অসীম অনন্ত অরূপ অমূর্ত্ত। ইষ্ট যদি মূর্ত্ত

হয়েই দেখা দিল তবে সাধকের সাধনারও সাঙ্গ হল, ইষ্টও আর ইষ্ট রইল না। কিন্তু আবার তাই বলে রবীন্দ্রনাথের ইষ্ট যে উপনিষদের—

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং

তা নয়। তাঁর কাম্য হল উপনিষদের আর-এক উপলব্ধি

রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব

কিম্বা—

অশরীরং শরীরেষ্বনবস্থেষ্ববস্থিতম্

সেই পরম সত্যের কোনই রূপ নাই বলে যে তিনি অরূপ—তা নয়; তিনি অরূপ, কারণ তাঁর রূপের সীমা নাই, কোন বিশেষ রূপের মধ্যে এসে নিঃশেষ ধরা দেন না। তিনি কেবল অসীম অনন্ত নন, তিনি হলেন আনন্দং অমৃতং, তিনি হলেন প্রেয়। সেই প্রিয় রয়েছেন সকল রূপের আড়ালে, রূপের ভিতর দিয়ে কখন দেখা যায় কি না-যায় বলা যায় না—এই রকমেই তিনি মানব-আত্মাকে নিরন্তর তাঁর দিকে আকৃষ্ট করে চলেছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ইষ্টকে চাক্ষুষ দেখেন নাই—নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেন নাই, করতে চান

নাই—তাকে দূরে রেখে, আবডাল করে, তাকে অজস্র ভাবে ভঙ্গিমায় নামে রূপে রঙে ছন্দে আভাষে ইঙ্গিতে কুহেলিময় রহস্যময় করে তুলেই তাঁর আনন্দ ও সার্থকতা। সে-বস্তু অনন্ত অসীম, আরও এই জন্য যে তা অজানা-অচেনা, অথবা প্রায় অজানা-অচেনা—কাছে থেকেও দূরে, দূরে থেকেও কাছে—তদ্দূরে তদন্তিকে। তাই ত সে হল যেন অপরিচিতা বিদেশিনী কৌতুকময়ী ছলনাময়ী। পরমপ্রীতির আস্পদ হলেও, একটা নিরন্তর বিচ্ছেদই সেই প্রীতিকে গাঢ় তীব্রমধুর উছল উদ্বেল করে ধরেছে। দূর সুদূরের জন্য এই যে চির বিরহজ একটা আকূতি পাশ্চাত্য কবি শেলীকে আকুল করে তুলেছিল, তাঁর Skylark ছিল এই আকূতির জীবন্ত বিগ্রহ। শেলীর প্রেমাস্পদও এই রকম অতিদূরের অভীষ্ট—

The desire of the moth for the Star
Of the night for the morrow,
The devotion to something afar—

এ কথা রবীন্দ্রনাথেরও মর্ম্মকথা। রবীন্দ্রনাথকে যে এক সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতেরা বাংলার শেলী বলতেন তার হেতু এই দিক দিয়ে উভয়ের একটা সাদৃশ্য।

পাশ্চাত্যের ধর্ম্ম-ইতিহাসে এই আধ্যাত্মিক আকূতি বা আস্পৃহার নাম দেওয়া হয়েছিল Quest—সন্ধান। Holy Grail-এর সন্ধানে খৃষ্টীয় নাইট-(Knight)দের অভিযান, এই রূপক কথা এক সময়ে ইউরোপীয় চিত্তকে অনেকখানি আচ্ছন্ন করে ধরেছিল—শিল্পে সাহিত্যে তার পরিচয় অনেক রয়ে গেছে। আমি পাশ্চাত্যের অবতারণা করছি এই জন্য যে রবীন্দ্রনাথের কবিচেতনায় ঔপনিষদ সুর যতখানি রয়েছে, পাশ্চাত্যের সুরও তার অপেক্ষা কম নাই—অনেক সময়েই দেখি ভিতরের অস্থিমজ্জাকে, আন্তর সত্তাকে যদি এনে দিয়ে থাকে বেদান্ত, রক্তমাংস এসেছে ইউরোপ হতে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই উভয়ের সংমিশ্রণ এক অপরূপ রসায়ন (alchemy)।

সে যা হোক, আস্পৃহার অনুসন্ধিৎসার অভিযান অভিসারের যে বৈশিষ্ট্য আমরা উল্লেখ করেছি তার হতে রবীন্দ্রনাথের চিত্তধারায়—সুতরাং তাঁর কাব্য-রীতিতে দুটি গুণ দেখা দিয়েছে। প্রথমত, গতিবেগ, ছন্দের দোল, সুরের মূর্চ্ছনা। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' হতে সুরু করে 'হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে' আর 'ঐ আসে

ঐ অতি ভৈরব হরষে' দিয়ে বলাকার 'পাখার শব্দ উদ্দাম চঞ্চল' অবধি একই ভঙ্গি 'বিলোল-হিল্লোল' হয়ে চলেছে। অন্তঃপুরুষের, হৃদ্গত চেতনার একটা নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতির জন্য অধীরতা, প্রতিনিয়ত আরো বেশি, আরো দূরে, আরো ঊর্দ্ধে এগিয়ে চলা অন্তঃস্থ ভাগবত-অগ্নিশিখার এই হল ধর্ম্ম। তাই ত পথচলার আনন্দ, আশ্রয়ে কোথাও আবদ্ধ থাকা নয়, নিরন্তর চলা—চলার জন্য চলা মানুষের ও জগতের ব্রত ও জীবনসাধনা হয়ে ওঠে। বৈদিক মন্ত্র—চরৈবেতে—রবীন্দ্রনাথের তাই এত প্রিয় মন্ত্র। লক্ষ্য বলে একটা বিশিষ্ট স্থির বস্তু কিছু আছে কি? আজ যা লক্ষ্য কাল তা পার হয়ে যাই, আর-এক লক্ষ্য সম্মুখে ফুটে ওঠে, আজকার উত্তুঙ্গ শিখর কাল পদতলে, তার পিছনে ভেসে ওঠে উত্তুঙ্গতর শিখর, তার পিছনে আরও উত্তুঙ্গতর, এই রকমে অনন্ত শ্রেণী চলেছে। দাঁড়াবার, ইতি বলে বসে পড়বার উপায় নাই। কবির প্রাণের কথা তাই--

সবারে দিয়েছ ঘর,
আমারে দিয়েছ শুধু পথ—

কিম্বা

ওরে গৃহ নাই, নাই ফুল-শেজ-রচনা।
আছে শুধু পাখা, আছে মহা নভ-অঙ্গন

ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা॥

আরও

জীবন পথের হে সারথি
আমি নিত্য পথের পথী
পথে চলার লহ নমস্কার—

রবীন্দ্রনাথে এই গতিময়তার দিকটি খুবই স্পষ্ট—কেউ কেউ এই সম্পর্কে বের্গসনের কথা উল্লেখ করেছেন। উভয়ে সাদৃশ্য অনেক আছে, কিন্তু পার্থক্যও মূলগত মর্ম্মগতই বলে আমার মনে হয়। বের্গসনের গতিময়তা হল চরম একমাত্র আদি সত্য—তা অহেতুক গতিময়তা আর তাতে অন্য গুণ আছে কি না সন্দেহ। এই অহেতুক গতিময়তার মধ্যে একটা বিবর্ত্তনের ধারা লক্ষ্য করা যেতে পারে বটে কিন্তু গতিধর্ম্মের সেটি গৌণ লক্ষণ। এ গতির মধ্যে উদ্দেশ্য কিছু নাই—

উদ্দেশ্য যদি থাকে তবে গতি হারিয়ে বসে তার স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত্ত ছন্দ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্যের সন্তান—সম্মুখের গতিশীলতা নিয়ে যতই তিনি মাতোয়ারা হয়ে উঠুন না, পশ্চাতে কোথাও রয়েছে ঔপনিষদ একটা নীড়স্থ স্থিতি : তাঁর চলা যতই চলার জন্য চলা হোক না, তিনি জানেন সকলের পারে অন্তিমে রয়েছে—

অকূল শান্তি, সেথায় বিপুল বিরতি

ধীর গম্ভীর গভীর মৌন মহিমা

রবীন্দ্রনাথে গতি একান্ত হারা-উদ্দেশ্য নয়, অন্ধ নয়—তা জ্যোতির্ম্মুখী, জ্যোতির্ম্ময়—

আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।
তা'র নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্ব্বাচলে আলোকে আলোকে।

আবার

অমর পুষ্প তব
আলোক পানে লোকে লোকান্তরে
ফুটুক নিত্য নব।

এ গতি হল আমরা বলেছি মূলতঃ একটা আধ্যাত্মিক আস্পৃহা, ভগবৎমুখী ব্যাকুলতা—এখানে আছে শ্রী, এখানে আছে হ্রী—তা উজ্জ্বল তা মধুর, প্রগাঢ় প্রখর, আবার শালীন ও স্বচ্ছ। বের্গসনের élan vital প্রধানতঃ প্রাকৃত প্রাণজ গতিবেগ—শেষের দিকে খৃষ্টীয়ভাবের প্রলেপ দিয়ে তাকে যতই আধ্যাত্মিক পদবাচ্য করে চলতে চেষ্টা করুন না।

তবে এ ঠিক যে গতিময়তাই দিয়েছে রবীন্দ্রনাথের প্রকাশ বৈশিষ্ট্য। যে প্রশান্তি ও নীরবতার কথা তিনি মাঝে মাঝে বলেছেন তা রয়েছে ভিতরের প্রচ্ছন্ন চেতনায় আশ্রয় হিসাবে কিম্বা দূরের আশা ও প্রত্যাশা হিসাবে—ছন্দের অন্তরে যেমন যতি, সুরের অন্তিমে যেমন সম। এই সুরও রবীন্দ্রনাথের গতিময়তার আর-এক নাম। সুর ধ্বনি মূর্চ্ছনা গতির স্বাভাবিক প্রকাশ—

যে চলে সেই গান গেয়ে যায়
সব-পেয়েছির দেশে।

কিম্বা

দূর হতে দূরে
বাজে পথ শীর্ণ তীব্র দীর্ঘতান সুরে—

নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গীতের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ প্রায়। আধ্যাত্মিক উপলব্ধির দিক দিয়েও দেখি—যেখান হতে উদ্ভূত আস্পৃহা, সেখান হতেই উদ্ভূত আহ্বান—হৃদ্‌গত অনাহত বাণী সে ত অভীপ্সার ঊর্দ্ধায়িত আত্মপ্রকাশ ও আত্মঘোষণা—

আমার অনাগত,
আমার অনাহত
তোমার বীণা-তারে
বাজিছে তা'রা,

স্মরণ করুন এই সঙ্গে শেলীর—

And singing still dost soar and soaring ever singest—

রবীন্দ্রনাথকে আমরা গানের রাজা বলে জানি। গানের গীতিকাব্যের ভিতর দিয়েই তাঁর কবিচিত্তের সহজ স্বরূপ প্রকাশ হয়েছে।

যথাসম্ভব অনির্দ্দেশ্যের অভিমুখে যথাসম্ভব স্বচ্ছন্দ স্বৈর গতি রবীন্দ্রনাথে দ্বিতীয় গুণটি যে এনে দিয়েছে তার কথা এখন বলি—গুণটিকে এক সময়ে খুবই দোষ বলে অনেকে ঘোষণা করেছিলেন। এক দল

নাম দিয়েছিলেন অস্পষ্টতা, আর-এক দল তার নাম দিয়েছিলেন বস্তুতন্ত্রের অভাব। শুনুন না 'সোনার তরী'—

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা বসে' আছি, নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভারা ভারা ধান কাটা হ'ল সারা,
ভরা নদী ক্ষুরধারা খর-পরশা।
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা।—

সুন্দর ভাষা সুন্দর ছন্দ সুন্দর ছবি মনোহর নেশায় মন-প্রাণকে আপ্লুত করে—কিন্তু সার পদার্থ কি আছে, কোন প্রত্যক্ষ জাগ্রত উপলব্ধি মূর্ত্ত হয়েছে এখানে? একটা কিছু উপলব্ধির প্রয়াস আছে বটে, কিন্তু কিছুই দানা বাঁধে নাই—সবই গলে তরল হয়ে চলেছে, বাষ্প হয়ে প্রায় উবে যায়। এই ক্লাসিকপন্থী সমালোচকেরা তাই বলতেন রবীন্দ্রনাথের হল কল্পনার খেয়ালের খোস-মেজাজের ছায়াবাজী মায়ারচনা—তাতে সত্যদ্রষ্টার স্পষ্ট পরিচ্ছিন্ন দ্বিধাহীন নিশ্চয়তা নাই—বৈদিক ঋষির মত রবীন্দ্রনাথ বলতে পারেন না 'জ্যোক্ চ সূর্যং দৃশে'—সূর্য্যের দিকে চোখ খুলে

অনিমেষ যেন চেয়ে থাকতে পারি। এ কথা কতকটা হয়ত ঠিক যে বিশ্বসাহিত্যে কবিহিসাবে যাঁরা একেবারে সকলের উপরে স্থান পেয়েছেন তাঁদের সঙ্গে রবীন্দ্র-নাথের তুলনা করলে পার্থক্য দেখা যায় এই যে তাঁদের সৃষ্টিতে বাক্য আর বস্তু এ দুটির মধ্যে রয়েছে যথাসম্ভব নিখুঁৎ সামঞ্জস্য ও সাম্য, কিন্তু রবীন্দ্রনাথে মোটের উপর দেখি বাক্যের ভাগ যেন বস্তুর অপেক্ষা কিছু বেশি, আর এই জন্য মনে হয় কবিত্বের ওজন যেন একটু কম—তাঁরই কথার ও রীতির অনুসরণে বলা যেতে পারে, পরিপূর্ণতার মধ্যেও এখানে রয়েছে একটা অপূর্ণতা। অবশ্য বস্তু অর্থ কেবল অর্থসম্পদ বা বিষয়-গরিমা নয়—বস্তু অর্থ ভিতরের সার পদার্থ, সংবস্তু, চেতনায় সংগৃহীত সঞ্জীবিত এক রসময় সত্য। তবে বলা যেতে পারে, এও হল সৃষ্টির একটা বিশেষ রীতির বিধান—রবীন্দ্রনাথ অনুসরণ করেছেন আর-এক বিধান। একটি উদাহরণ এখানে নিতে পারা যায়। মাইকেল এঞ্জেলো ভাস্কর-হিসাবে শিল্পীশ্রেষ্ঠদের শীর্ষদেশে। তাঁর তক্ষণের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে মূর্ত্তিখানি তিনি সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ করতেন না, খানিকটা অসম্পূর্ণ

খে দিতেন, আনকোরা পাথরটা এখান দিয়ে ওখান
়যে কিছু জেগে থাকত। হয়ত তিনি এই উপায়ে
ঙ্গত করতেন যে মূর্ত্তিটি বিশ্বপ্রকৃতির স্বাভাবিক
ৌন্দর্য্যের অঙ্গীভূত হয়ে রয়েছে, তা মূর্ত্তি মাত্র নয়—
কদের আদর্শ যে নিখুঁৎ নিটোল সর্ব্বাঙ্গসুষ্ঠু, নিজের
ধ্য নিজে পূর্ণ ও সার্থক একটা বিচ্ছিন্ন রচনা মাত্র সে
ম নয়। আমাদের দেশে গোটা পাহাড়ের গায়ে
নিকটা কেটে মূর্ত্তি বা গুহামন্দির গড়ে তোলা একটা
তি ছিল, তারও অর্থ ছিল আর্ট ও প্রকৃতির অভিন্নত্ব
তিপাদন করা—আর্টকে প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে
শিয়ে ধরা। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও অনুরূপ একটা
ফাই দেওয়া যেতে পারে। সার বস্তুর মধ্যে একটা
রল্য, লঘুভার,—তনুর তনিমা—ঋজুতার পরিবর্ত্তে
কটা তির্য্যক ও বলয়িত গতি ফুটে উঠেছে মূল
রণার, চেতনার ধর্ম্মের চাপে ও প্রয়োজনে। আর
হল আমরা যে বলেছি একটা চির সচল, নিরন্তর
ায়মান আস্পৃহার আবেগ—দূর সুদূরের পিপাসা
অন্তঃপুরুষের অনির্ব্বাণ অগ্নিশিখা, নিত্যপ্রসরমান
্যাতিঃলেখা। এই যে অন্তরের অন্তহীন সীমাহীন

অবাধ অবিশেষ আকৃতি, এই যে নিরুদ্দেশ যাত্রা, ঐ যে

পশ্চিমপানে অসীম সাগর,
চঞ্চল আলো আশার মতন
কাঁপিছে জলে—

কিম্বা

হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে—

কবি তাকে নিবিড় জীবন্ত করবার জন্যই, তার স্বধর্ম্মকে অনুভবগম্য করে ধরবার জন্যই তাকে একটা স্পষ্ট মূর্ত্ত উপলব্ধির মধ্যে পরিচ্ছিন্ন করে ধরেন নাই। উপলব্ধি অর্থ মিলন—কবি মিলনকে চান নাই। কবির মর্ম্মবাণী—

কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো!
বিরহানলে জ্বালোরে তারে জ্বালো।—

সেণ্ট অগস্টাইনের একটি কথা আছে, নিজের অন্তর্জীবনের এক অবস্থা সম্বন্ধে বলছেন, তখন তিনি ভালবাসতে সুরু করেন নাই, তবে ভালবাসাকে ভালবাসতে সুরু করেছেন। রবীন্দ্রনাথের চিত্তের রঙ অনুরূপ একটা ভাবে রঞ্জিত।

২

রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তে চেতনার এই মূল স্থর ও ঐক্যস্থত্র—এই একই জিনিষ—আস্পৃহার চির-সচল উর্দ্ধমুখী গতি—বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন বয়সে—কি রকমে বিভিন্ন ভাবে ও ভঙ্গীতে, নামে, রূপে ব্যক্ত হয়েছে, তা এক চিত্তাকর্ষক প্রসঙ্গ। তার মোটা একটা নির্দ্দেশ আমরা দিতে পারি। আরম্ভ 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' দিয়ে—

> শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,
> ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
> হেসে খল খল্, গেয়ে কল কল্
> তালে তালে দিব তালি।

এখানে আকৃতির প্রথম জাগরণ—সে তরুণ কিশোর, চপল উছল হাস্যলাস্যমুখর বাহ্যদৃষ্টিপ্রধান স্থূলকর্ম্মব্রতী। তারুণ্যের উদ্বেল উৎসাহ মূর্ত্ত এখানে। তারপর ধরুন 'সোনার তরী', আর-এক ভাব, আর-এক অবস্থা—

> গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে!
> দেখে' যেন মনে হয় চিনি উহারে।

ভরা-পালে চলে' যায় কোনো দিকে নাহি চায়,
ঢেউগুলি নিরুপায় ভাঙে দু'ধারে,
দেখে' যেন মনে হয় চিনি উহারে !

চেতনা অন্তর্ম্মুখী হয়েছে, যৌবনের প্রথম বিরহের স্বাদ প্রাণে লেগেছে—মধুর, তীব্র, করুণ। আস্ফোট আড়ম্বর নাই, আছে একটা নিবিড় মর্ম্মস্পর্শী মূর্চ্ছনা, একতারার তীব্র আহ্বান—অনুভব গাঢ়, আন্তরিকতায় সহজ স্বচ্ছন্দ। সেই সঙ্গে ক্রমে জেগেছে একটা কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা—তাতে জীবনরহস্য আরও রহস্যময় ও রসময়ই হয়ে উঠেছে।

তারপর আর একটু আগে 'পরশ পাথরে' শুনি—

পুরাতন দীর্ঘপথ পড়ে' আছে মৃতবৎ
হেথা হ'তে কতদূর নাহি তা'র শেষ।
দিক হ'তে দিগন্তরে মরুবালি ধূধূ করে
আসন্ন রজনী-ছায়ে ম্লান সর্ব্বদেশ।

একেই খৃষ্টীয় সাধুরা বলতেন না কি dark night of the soul? পুরাতনকে ছেড়ে এসেছি, নূতনকে পাই নি—নূতনের আস্বাদ পেয়েছি কিন্তু তাও কখন হারিয়ে গেছে—পুরাতনে ফিরবার উপায় নাই, নূতনের

পথ জানি না—একটা অসহায় ব্যাকুলতা গুমরে উঠেছে। তবে আমাদের কবির বাত্রি খৃষ্টান সাধুদের রাত্রির মত ততখানি অন্ধকার কখনই নয়। 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় একই সুর—'আধার রজনী'র কথা; কিন্তু তার মধ্যে সেই 'পলাতকা'র নীরব হাসি ঝিকিমিকি ফুটে উঠেছে,—কবি বলতে পারছেন তারই মধ্যে

শুধু ভাসে তব দেহ-সৌরভ,

গায়ে উড়ে পড়ে বায়ুভরে তব
কেশের রাশি—

রবীন্দ্রনাথে বেদনা কখন একান্ত, কখন ট্রাজিক হয়ে ওঠে নি—কারণ তাঁর বিরহের মধ্যে মিলন প্রচ্ছন্ন রয়েছে—মরণ রে তুঁহু মম শ্যামসমান—মৃত্যু মৃত্যু নয়, তার মধ্যে লুক্কায়িত অমৃতত্ব। যার অনুসরণে কবি নিরন্তর চলেছেন তার একটা সন্ধান সর্ব্বদাই তাঁর মিলেছে। এই আকৃতির চরমোৎকর্ষ, তার পূর্ণ দৃষ্টি ফুটে উঠেছে উর্ব্বশীর মধ্যে। কবি এখানে তাঁর প্রাণের যাবতীয় তন্ত্রী টেনে বেঁধেছেন তাঁর অন্তশ্চেতনার যথাসম্ভব উচ্চ গ্রামে—অনুভব যেমন নিবিড়, ভাষা

তেমনি গাঢ়বন্ধ, ছন্দ তেমনি মহত্ত্বপূর্ণ। তাঁর কবিত্বে খাঁটি মহাকাব্যের ওজন এই একবার অন্ততঃ দেখা দিয়েছে। কবির কণ্ঠে এপিক গরিমা ফুটে উঠেছে।

সুরসভাতলে যবে নৃত্য কর পুলকে উল্লসি'
হে বিলোল-হিল্লোল উর্ব্বশী!
ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে সিন্ধুমাঝে তরঙ্গের দল,
শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল,
তব স্তনহার হতে নভস্তলে খসি পড়ে তারা,
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা,
নাচে রক্তধারা!
দিগন্তে মেখলা তব টুটে আচম্বিতে
অয়ি অসম্বৃতে!

এর পরের যুগে কবির পরিণত প্রৌঢ় চেতনার অবস্থায় —'খেয়া'র যুগে—কবি একটা সহজ সাধারণ ঘরোয়া বা নিত্যনৈমিত্তিকের সুরে চলনবলনে নেমে এসেছেন। বসনভূষণের আতিশয্য খসে গিয়েছে, আটপৌরে সহজশ্রী—বসন্তের ঐশ্বর্য্য নয়, শরতের শালীনতাই এখন যথেষ্ট হয়েছে—এখনকার আস্পৃহা যেন বাউলের একতারায় মেঠো ও মিঠে সুর—

ওপারেতে সোনার কূলে আঁধার-মূলে কোন্ মায়া
গেয়ে গেল কাজ-ভাঙানো গান—

'গীতাঞ্জলি'র ও 'গীতালি'র বেশির ভাগে এই সুরই প্রাধান্য পেয়েছে। এর পরে কবির কণ্ঠে আর-একবার উদাত্ত আবেগে ঝঙ্কৃত হয়েছে—সুর উঠেছে উচ্চতর পর্দ্দায়, তান পেয়েছে দীর্ঘতর প্রসার, গতির মধ্যে চাঞ্চল্য অপেক্ষা এসেছে দৃঢ়তা, তারল্যের চূর্ণধর্ম্মী নয়, ঘনীভূত ভাবের দুর্দ্দমনীয় টান, গভীরের দোল—আমি বলছি 'বলাকা'র কথা—

শুনিতেছি আমি এই নিঃশব্দের তলে
শূন্যে জলে স্থলে
অমনি পাখার শব্দ উদ্দাম চঞ্চল।
তৃণদল
মাটির আকাশ পরে ঝাপটিছে ডানা;
মাটির আঁধার-নীচে কে জানে ঠিকানা—
মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।
দেখিতেছি আমি আজি
এই গিরিরাজি,
এই বন, চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানায়

দ্বীপ হ'তে দ্বীপান্তরে, অজানা হইতে অজানায় !
নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে
চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে—

আমার মনে হয় না রবীন্দ্রনাথ আবার কখন এই পর্দ্দায়, এতখানি তানবিস্তারে তাঁর বাণীকে মূর্ত্তিমতী করেছেন। রকমারি প্রাচুর্য্য, বহুধা বৈচিত্র্য অনেক এসেছে—তাদের সকলের বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সৌন্দর্য্য রয়েছে, সৌষ্ঠব রয়েছে কিন্তু এতখানি মহত্ত্ব ও ঔদার্য্য আছে কি না সন্দেহ। এখানে যে গতির আবেগ ব্যক্ত হয়েছে তা কেবল মানুষের বা জীবের আস্পৃহার কথা নয়—জড় মাটির, মূক পৃথিবীর নিজের আস্পৃহা অপরূপ গাঢ়-কণ্ঠে ব্যক্ত হয়েছে,—কেবল সচেতন সত্তা নয়, অবচেতন সত্তার মধ্যেও স্পন্দিত এক নিবিড় অধীর ঊর্দ্ধমুখী আবেগ, সমগ্র সৃষ্টির একেবারে তলা থেকে সমগ্র আধার বেয়ে উঠে চলেছে এক অতন্দ্র আলো-অভিসার—এ কথাটি কেবল সুষ্ঠু করে যে বলা হয়েছে তা নয়, তাকে মূর্ত্ত করা হয়েছে বাক্যে ও ছন্দে, তার সজীব বিগ্রহ যেন এখানে পেয়েছি। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে' এ বার্ত্তার প্রথম কাকলি ফুটে উঠেছে—

যদিও নির্ঝর সেখানে একটা প্রতীক বা উপমা মাত্র, একটা কেবল আশ্রয় ও অবলম্বন—আর ভিতরের ভাবও অনেকখানি ঔপদেশিক ও প্রচারধর্ম্মী—তা হলেও মূলত স্বপ্ন একই—তাই বলতে পারি নির্ঝর দিয়ে যা আরম্ভ—একটি তন্ত্রীর স্বরমূর্চ্ছনা, একটি অঙ্গের আবাহন—বলাকা দিয়ে সর্ব্বাঙ্গের সমবেত ঐক্যতানে তার পরিণতি—the wheel came full circle—একটা চেতনা-চক্রের এইভাবে পূর্ণাবর্ত্তন হয়েছে।

রবীন্দ্র-প্রতিভার ধারা

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে, তাঁর চিত্তের ও চেতনার গড়নে তিনটি—কি চারটি—ধারা প্রবহমান ; এ কয়েকটি মিলে মিশে তাঁর কবি-স্বভাবের, তাঁর সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য গড়ে দিয়েছে। ধারা ক'টি হল—প্রথম, উপনিষদের ধারা ; দ্বিতীয়, বৈষ্ণব-ভাবের ধারা ; তৃতীয়, 'পেগান' (Pagan) অর্থাৎ বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গত সৌন্দর্য্যভোগের ধারা ; আর চতুর্থ যোগ করা যেতে পারে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি বা যুক্তিবাদের ধারা।

আমরা মনস্তাত্ত্বিকদের ভাষা ধার করে বলতে পারি ঔপনিষদ-ভাব রবীন্দ্রনাথের ঊর্দ্ধতর বুদ্ধিকে ভাস্বর করেছে, বৈষ্ণব-ভাব তাঁর হৃদয়কে (ঊর্দ্ধতর প্রাণকে) সরস ও বিদগ্ধ করেছে, সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা তাঁর নিম্নতর প্রাণ ও ইন্দ্রিয়কে অপরূপ মোহিনী শক্তিতে ভরে দিয়েছে। আর আধুনিক বৈজ্ঞানিকবুদ্ধি বাহ্যমানসসত্তাকে, মস্তিষ্কের পরিধিকে পরিপূর্ণ করে সকলকে ঘিরে—অনেক সময়ে সূক্ষ্মভাবে—একটা ব্যাপক আবহাওয়া রচে দিয়েছে। তবে এই সংমিশ্রণ

বা যোগাযোগের ফলে কোন ধারাটিই তার স্বকীয় বিশুদ্ধ স্বরূপ বজায় রাখতে পারে নি—প্রত্যেকে একটা নূতনত্ব অর্জ্জন করেছে, সকলের উপর পড়েছে একটা রাবীন্দ্রিক ছাপ্।

প্রথম ঔপনিষদ ধারা—

"শোনো বিশ্বজন—,
শোনো অমৃতের পুত্র যত দেবগণ*
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে,
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ম্ময়; তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি'
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার, অন্য পথ নাহি।"

অনুবাদ হলেও, এ মন্ত্র রবীন্দ্র-চেতনার কাঠামোটি দিয়েছে। নিজের ভাষায় ও ভঙ্গীতেও তিনি বলছেন—

এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণ-তরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্বদিগ্বিজয়ে
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে—

---

* রবীন্দ্রনাথ এখানে উপনিষদের মূল একটু পরিবর্ত্তিত করে দিয়েছেন। মূলে দেবগণ নয় মানুষকেই অমৃতের পুত্র বলে আহ্বান করা হয়েছে।

এর সঙ্গে স্মরণ করুন উপনিষদের 'সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং'। তবে অবশ্য সিদ্ধান্তের দিক দিয়ে ততখানি না হোক, কান পেতে শুনলে সুরের পার্থক্য ইতিমধ্যেই আমরা কিছু ধরতে পারি। আরো শুনুন—

নিয়ে যাও সেইখানে নিঃশব্দের গূঢ়গুহা হতে
যেখানে বিশ্বের কণ্ঠে নিঃসরিছে চিরন্তন স্রোতে
সঙ্গীত তোমার—

ঔপনিষদ অনুভূতি এখানে পিছনে সরে চলেছে, সম্মুখে আসছে দ্বিতীয় ধারার দোল। আরো আগে চলুন—

শেষের মধ্যে অশেষ আছে…
সবার চেয়ে বড় যে গান
সে রয় বহুদূরে—

কিম্বা

সীমার মাঝে, অসীম, তুমি
বাজাও আপন সুর—

এখানে জাগছে এই ঔপনিষদ কথার স্মৃতি—

অশরীরং শরীরেম্বনবস্থেম্ববস্থিতং।

আবার যখন শুনি

সত্য মুদে আছে
দ্বিধার মাঝখানে

মৃত্যু ভেদ করি

অমৃত পড়ে ঝরি—

তখন স্বতঃই আমাদের মনে এসে যায়—

অসতো মা সংগময়……

মৃত্যো মা অমৃতংগময়—

অথবা এই আর-এক মন্ত্র

কথা তারে শেষ করে

পারে নাই বাঁধিতে

গান তারে স্থর দিয়ে

পারে নাই সাধিতে—

এর পিছনে রয়েছে যে প্রাচীনতর মন্ত্র তা হল এই—

অবাঙমনসগোচরং

কিম্বা

যদ্বাচা নাভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে—

আরও উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের নিভৃতচেতনা কতখানি ঔপনিষদ ভাবে ওতপ্রোত ছিল সে কথা বুঝবার জন্যে। শুনুন—

নয়ন সম্মুখে তুমি নাই,

নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই

শ্যামলে শ্যামল আজি তাই তুমি নীলিমায় নীল—

অথবা

নয়ন তোমারে দেখিতে পায় না
রয়েছ নয়নে নয়নে।

এ আধুনিক অনুভবের বৈদান্তিক উৎস হল

যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষুংষি পশ্যতি—

তবে পার্থক্যের বা বৈষম্যের কথা যে উল্লেখ করেছি তাও এখন বুঝতে পারি। উপনিষদের হল জ্ঞানঘন স্থিরবিদ্যুৎসম উপলব্ধি; আর রবীন্দ্রনাথের হল অনুভূতি বা অনুভব, তা প্রাণাবেগে ভাববৈদগ্ধ্যে সচল চঞ্চল উদ্বেল জটিল—একদিকে তার মধ্যে এসেছে হৃদয়ের প্রাণের প্রবেগ, অন্যদিকে রয়েছে মন-বুদ্ধির চিন্তাচাতুর্য্য। উপনিষদের উপলব্ধি সাক্ষাৎদৃষ্টি—তার অন্য নামই হল 'সাক্ষাৎকার'—ঐ উভয় ধরণের মিশ্রণ হতে মুক্ত ছিল। তাই হৃদয়ের ভাববিলাস রবীন্দ্রনাথকে উপনিষদের মত ততখানি জ্যোতিষ্মান নির্ম্মুক্ত জ্ঞানের নয় যতখানি প্রেমের অনুরাগের মধুরতার কবি করে তুলেছে—

বন্ধু হয়ে পিতা হয়ে জননী হয়ে
আপনি তুমি ছোট হয়ে এস হৃদয়ে।

উপনিষদেও আছে 'পিতা নোঽসি'—কিন্তু উপনিষদ-কার জানেন এ হল একটা কথা বলার ধরণ ; কারণ আসল সত্য ত

নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ

কিম্বা

ন বা অরে পুত্রস্য কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি
আত্মনস্তু কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রাণ নিংড়ে যেন ঝরছে এই বাণী

ঐ শোনো গো অতিথ্ বুঝি আজ,
এলো আজ।
ওগো বধূ, রাখো তোমার কাজ,
রাখো কাজ—

অথবা

ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর
তোমার প্রেম তোমারে এমন করে
করেছে নিঠুর—

আর এই হল রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণব-ভাব ; কিন্তু এই সাধারণ বৈষ্ণব-ভাবও শেষে মনে হয় যেন কবির পক্ষে যথেষ্ট সরস বিদগ্ধ, যথেষ্ট সহজ অন্তরঙ্গ আবেশভরা

বাঁধনহারা হয় নাই, তাই বৈষ্ণব-ভাবকে পিছনে ফেলে তিনি সরে চলে এসেছেন বাউল-ভাবের মধ্যে—

সহজ হবি সহজ হবি
ওরে মন সহজ হবি
কাছের জিনিষ দূরে রেখে
তার থেকে তুই দূরে রবি—

কিম্বা

রূপসাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপ রতন আশা করি ;
ঘাটে ঘাটে ঘুরব না আর
ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী—

তবে এখানে নির্দ্দেশ করা প্রয়োজন যে রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণব-ভাবও গোঁড়া বৈষ্ণব-ভাব নয়। প্রথম কথা, বৈষ্ণব-ভাবের মর্ম্ম হল ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে একটা একান্ত ব্যক্তিগত ভাবস্থিরতার রসময়তার সম্বন্ধ—ভক্তের চেতনায় দৃষ্টিতে ভগবানের প্রেমময়-মূর্ত্তিটি ছাড়া আর কিছু নাই—বিশ্ব হারিয়ে গেছে, লোপ পেয়েছে—ভগবানের আর কোন আকার বা রূপের সংবাদ তিনি রাখেন না। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এতখানি আত্মভোলা

হয়ে ওঠা সম্ভব হয় নাই, এতখানি মূর্ত্তিপূজারী অর্থাৎ ব্যক্তিরূপী-মূর্ত্তিপূজারীও হতে পারেন নাই। খাঁটি বৈষ্ণবের যে অব্যভিচারী অনন্যমুখী একরসসার তন্ময়তা তা ঠিক রবীন্দ্রনাথে নাই। ভগবানের মধুর মূর্ত্ত (মানুষ) রূপটি অপেক্ষা প্রভুরূপ ঈশ্বর-রূপটি তাঁর চিত্তকে বেশি দোলা দিয়েছে—এদিক দিয়ে তাঁর সাদৃশ্য বেশি বোধ হয় খৃষ্টীয় কিম্বা মোসলেম সাধকদের সাথে, তাঁরা ভগবানের বা ঈশ্বরের মহিমাকীর্ত্তনে বেশি আনন্দ লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথে প্রেমের প্রবাহ প্রাণের ঠাকুরের কাছে গিয়েছে বটে কিন্তু এ প্রাণের ঠাকুর প্রধানতঃ ঐশ্বর্য্যময়, সে প্রবাহ ব্যক্তি থেকে বিশ্বে, পুরুষ ছেড়ে প্রকৃতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে চেয়েছে; বৈষ্ণবের মানুষরূপী ভগবান তাঁর সাধ্য বা ইষ্ট নয়, আবার নিরাকার নির্গুণ পুরুষকেও তিনি একান্ত গ্রহণ করতে পারেন নাই—তিনি করেছেন নির্গুণ বা নিরাকার পুরুষের উপর প্রেমরূপ আরোপ—তাঁর ভগবান পুরুষ যদি হয় তবে তা ব্যক্তিপুরুষ নয়, বিশ্বপুরুষ। ভগবানের নাম করতে, ভগবানের চিন্তা করতে সর্ব্বদা প্রকৃতিকে তাই তিনি আহ্বান করেছেন।

আছ অনলে অনিলে চির নভোনীলে
ভূধরে সলিলে গহনে

অতি পরিচিত জিনিষ। এর হেতু তাঁর চেতনায় আর-একটি স্তরের—তাঁর যে 'পেগান'-প্রকৃতি তার প্রভাব। বৈষ্ণব কবির মন্ত্র—

হিয়ে হিয়া রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল—

এখানে রয়েছে দুটি চিত্তের একান্ত অন্যোন্যাশ্রয়ী সংযোগ ও সম্মেলন, এ হল রসঘন 'কেবল' সম্বন্ধ। বৈষ্ণব কবি বলতে পারেন বটে—

গগনে অব ঘন মেঘ দারুণ
সঘন দামিনী ঝলকই
কুলিশ পাতন শবদ ঝনঝন
পবন খরতর বলগই—

কিম্বা

প্রদীপ জারি থারি পর রাখই
আরতি করতহি গাওত গীত—
ঝলকত ও মুখচন্দ।

কিন্তু স্পষ্টই আমরা দেখি এখানে বহির্মুখী দৃষ্টি অন্তরের তন্ময়তায় ভরপুর। প্রকৃতি বা বাহ্য-পরিবেশের

আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে, চিত্রণ করা হয়েছে অন্তরকে আরো গাঢ় আরো অন্তরমুখী করে ধরবার জন্য—তাদের নিজস্ব মূল্য বা সার্থকতা ত নাই, স্থানও গৌণ, স্বভাবও রূপান্তরিত, এমনভাবে আত্মসাৎ করা হয়েছে যে যেন তা অন্তঃকরণেরই অন্তর্গত হয়ে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথে প্রকৃতি সর্ব্বদাই পেয়েছে একটা স্বাধীন সত্তা, স্বকীয় মাহাত্ম্য—রেখেছে তার স্বাভাবিক ধর্ম্ম ; তার মধ্যে অন্তরের ভাব প্রসারিত বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছে, প্রায়শঃ হারিয়ে গেছে। তাই বুঝি কবি সহ্য করতে পারেন নি যে বৈষ্ণবের গান হবে কেবল বৈকুণ্ঠের জন্য। তা নয়, সমস্ত পৃথিবী, সকল জগৎ ও মানুষ থাকবে আমার চার দিকে, ভাগ নেবে আমার আনন্দে, আমার সুখেদুঃখে—এ ভাবে বাহিরকে বহুকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত ডেকে সাক্ষীরূপে না খাড়া করতে পারছি ততক্ষণ পর্য্যন্ত যেন নিজের অনুভব অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ বা সুদৃঢ় হতে পারছি না। বৈষ্ণব কবি সর্ব্বতোভাবে আত্মহারা, এতখানি সজ্ঞান নন—নিজের সম্বন্ধে হোক আর জগতের সম্পর্কে হোক।

তারপর দ্বিতীয় পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণব-ভাবে 'আত্ম'-জ্ঞান, আমি-বোধ একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে এবং বলতে হবে মূলতঃ তা অবৈষ্ণব। বৈষ্ণব-ভাবের সার নতি, প্রপত্তি। রবীন্দ্রনাথে সে জিনিষ কি তার বহু উল্লেখ আছে—তাঁর সজাগ মন তা ভুলতে পারে না—

আমার মাথা নত করে' দাও হে তোমার
চরণ-ধূলার তলে—

কিম্বা

আমার আমি ধুয়ে মুছে
তোমার মধ্যে যাবে ঘুচে।

আরো

তুমি আমার অনুভাবে
কোথাও নাহি বাধা পাবে
পূর্ণ একা দেবে দেখা।

কিন্তু আমার মনে হয় তাঁর চেতনায় এহ বাহ্য। তিনি স্বীকার করছেন বটে যে ভগবান ছাড়া আমি নাই, কিন্তু তার চেয়ে গভীরতর রহস্যকর সত্য হল আমি ছাড়া ভগবান নাই। কি রকম? চেতনার প্রথম স্তর,

আরম্ভ বটে প্রণতি প্রপত্তি—তার উদ্দেশ্য কি, অর্থ কি, সার্থকতা কি? না, এই—

আমার মাঝে তোমার লীলা হবে
তাই ত আমি এসেছি এই ভবে…
মরে গিয়ে বাঁচব আমি, তবে
আমার মাঝে তোমার লীলা হবে—

এ পর্য্যন্ত সিদ্ধান্ত বৈষ্ণবলীলাবাদ সম্মত। কিন্তু তার পরে—

আমি এলেম তাই ত তুমি এলে
আমার মুখ চেয়ে
আমার পরশ পেয়ে
আপন পরশ পেলে
আমায় দেখবে বলে তোমার অসীম কৌতুক
নইলে ত এই সূর্য তারা সকলি নিষ্ফল—

কিম্বা

তোমার খুসি চেয়ে আছে
আমার খুসির আশে—

সত্যকার বৈষ্ণব-ভাবের সীমানা প্রায় কেটে যায়। আমি ভগবানের জন্য যেমন আকুলি-বিকুলি করি, ভগবানও করেন আমার জন্য—এই যে একান্ত মানবীয় ভাবের

আরোপ (Anthropomorphism), এ আমাদের প্রাকৃত মনোবৃত্তিকে তৃপ্ত করবার কৌশল মাত্র। বৈষ্ণব-সাধক, এমন কি সহজ-সাধকও এ কথা বলতে ইতস্তত করবেন। অহংএর এ জাতীয় দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক যৌক্তিকতা হল আধুনিক মনোভাবের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। সত্যকার বৈষ্ণব বলছেন বটে—

হামার গরব তুহুঁ বঢ়ায়ল

কিন্তু এর সুর ও ঠাট সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, ব্যষ্টিমহত্ত্ব আধুনিক চেতনার অপরিহার্য্য অঙ্গ—তার মর্ম্মকোষ বললেও অত্যুক্তি হয় না। আমি ব্রাউনিংএর কথা পরে বলেছি—ব্রাউনিং ও রবীন্দ্রনাথের দর্শনে ও উপলব্ধিতে এ বিষয়ে বিশেষ সাদৃশ্য ও সাধর্ম্ম্য রয়েছে। রবীন্দ্রনাথে এ উপাদানটি তার পূর্ণ মর্য্যাদা পেয়েছে; তবে তার রূঢ়তাকে, কঠোরতাকে, আতিশয্যকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাববৈদগ্ধ্যে, চিন্তাচাতুর্য্যে, কবিত্বের ইন্দ্রজালে শোভন

সুন্দর হৃদিরঞ্জন নন্দনফুলহার

করে তুলেছেন।

ঔপনিষদ তত্ত্ব হোক, বৈষ্ণব রসবিলাস হোক,

এদের চেয়ে বেশি আমার মনে হয় রবীন্দ্র-চিত্তকে অধিকার করে আচ্ছন্ন করে রয়েছে প্রকৃতি-প্রেম—আমি বলতে যাচ্ছিলেম পৃথিবীর জলের ভাগের মত এই অঙ্গটি রবীন্দ্র-সত্তার তিন-চতুর্থাংশ। রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তের উন্মেষ ও উন্মীলনে প্রকৃতির স্পর্শই যে মূল হেতু বা নিমিত্ত ছিল তা তিনি নিজেই বলে গিয়েছেন। 'জল পড়ে পাতা নড়ে' এই মন্ত্রের ছন্দ ও চিত্র তাঁর শিশুপ্রাণকে দোলা দিয়েছে আশ্চর্য্য রকমে; তার পরে তাঁর কিশোর মনকে রসায়িত করেছে জয়দেবের 'নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং'—তাঁর সত্তা সেই একই ধারায় চলে বর্দ্ধিত হয়ে উপভোগ করেছে কালিদাসের 'মন্দাকিনীনির্ঝরশীকরাণাং বোঢ়া মুহুঃকম্পিত-দেবদারু'। আমি রবীন্দ্রনাথের এ দিকটির 'পেগান' বিশেষণ দিয়েছি; তার কারণ প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর যে সংযোগ সেটি যতখানি শরীরগত, ইন্দ্রিয়জ হতে পারে তাই। আদর্শের অধ্যাত্মের মিশ্রণ—প্রলেপ কিম্বা প্রসাধন. অলঙ্কার, বাহার পর্য্যন্ত বলা যেতে পারে—এ ক্ষেত্রটিতে যতই থাক, আসল অনুভবটি হল অমিশ্র আনকোরা প্রকৃতির, প্রকৃতির প্রাকৃত ধারা।

তুলনা করা যেতে পারে একটু। ধরুন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ—তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত প্রকৃতি-পূজারী—কিন্তু ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের চেতনা স্বভাবতই ছিল অন্তর্ম্মুখী (আধুনিক মনস্তাত্ত্বিকেরা কেউ কেউ বলবেন introvert)। প্রকৃতিকে তিনি দেখতেন অনুভব করতেন, এই অন্তর্মুখিতার ভিতর দিয়ে—প্রকৃতি তাঁর হাতে তাই পেয়েছে একটা প্রশান্তি, একটা স্বচ্ছতা, একটা সৌকুমার্য্য, একটা চিন্ময়তা। শেলীর দৃষ্টিতে প্রকৃতি বাহ্য রূপের সঙ্গে পেয়েছে একটা অন্তরের ভাব ও অর্থ, দুটিতে অভিন্ন হয়ে মিশে আছে, বাহ্য রূপটি ভিতরের ব্যঞ্জনার প্রতীক—বাহ্যটির চেয়ে ভিতরের অঙ্গটির উপর জোর বেশি। কীট্‌স্ আরো স্থূলভাবে, ইন্দ্রিয়ের বহির্ম্মুখতাকে আশ্রয় করে প্রকৃতির সাথে সংযোগ স্থাপন করেছেন, তা হলেও প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্বাধীনা ও স্বতন্তরী হয়ে উঠতে পারে নাই—সেখানেও একটা মানসভাবনা প্রকৃতির রূপায়নকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। আমাদের বৈদিক ঋষিরাও প্রকৃতির পূজারী ছিলেন—কিন্তু তাঁদের জ্যোতির্ম্ময় প্রজ্বলন্ত দৃষ্টিতে প্রকৃতি রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে—প্রকৃতিকে আর

প্রকৃতি হিসাবে দেখি না, দেখি অন্তশ্চেতনার বাহ্যপ্রকাশ ভাস্বরমূর্ত্তি হিসাবে। প্রকৃতির নিবিড় রঙ্ রেখা—অবয়ব—আমাদের কাছে ব্রহ্মচেতনারই অনুভব নিয়ে আসে।

আমার মনে হয় সাদৃশ্য যদি কোন কবির সঙ্গে থাকে তা হল কালিদাসের সঙ্গে। কালিদাসের উল্লেখ স্মৃতি, কালিদাসের অনুকরণ অনুসরণ রবীন্দ্রনাথে ইতস্তত যথাতথা প্রচুর বিক্ষিপ্ত রয়েছে। প্রকৃতিকে প্রকৃতি হিসাবে ভালবাসা, তাকে স্থূল ইন্দ্রিয়ের বিষয় হিসাবে বোধ করে স্থূল ইন্দ্রিয় দিয়ে গ্রহণ করা—কালিদাসের বৈশিষ্ট্য, রবীন্দ্রনাথেরও। শুনুন রবীন্দ্রনাথের হাতে কালিদাস—

কোথা আছে
সানুমান আম্রকূট ; কোথা রহিয়াছে
বিমল বিশীর্ণ রেবা বিন্ধ্য-পদমূলে
উপল-ব্যথিত-গতি ; বেত্রবতীকূলে
পরিণত-ফলশ্যাম জম্বুবনচ্ছায়ে
কোথায় দশার্ণ গ্রাম রয়েছে লুকায়ে
প্রস্ফুটিত কেতকীর বেড়া দিয়ে ঘেরা ;

পথ-তরু-শাখে কোথা গ্রাম-বিহঙ্গেরা
বর্ষায় বাঁধিছে নীড়, কলরবে ঘিরে
বনস্পতি—

তবে উভয়ে পার্থক্য আছে। কালিদাস প্রকৃতিকে গ্রহণ করেছেন ইন্দ্রিয়ের দৃষ্টি দিয়ে, রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছেন ইন্দ্রিয়ের অনুভব দিয়ে। কালিদাসে পাই চিত্রের ও ভাস্কর্য্যের ধর্ম্ম ও রীতি, রবীন্দ্রনাথে চিত্রের আর সঙ্গীতের ধর্ম্ম ও রীতি। স্পষ্টতর উদাহরণ

ঈশানের পুঞ্জমেঘ অন্ধবেগে ধেয়ে চলে আসে
বাধাবন্ধ-হারা,
গ্রামান্তের বেণুকুঞ্জে নীলাঞ্জন ছায়া সঞ্চারিয়া,
হানি' দীর্ঘধারা—

কিম্বা

এ নহে মুখর বন-মর্ম্মর গুঞ্জিত
এ যে অজগর গরজে সাগর ফুলিছে ;
এ নহে কুঞ্জ কুন্দ-কুসুমরঞ্জিত,
ফেনহিল্লোল কলকল্লোল দুলিছে ;
কোথারে সে তীর ফুল-পল্লব-পুঞ্জিত,
কোথারে সে নীড়, কোথা আশ্রয়-শাখা—

ঠাট আরও স্পষ্ট

গুরু গুরু মেঘ গুমরি' গুমরি'
গরজে গগনে গগনে
গরজে গগনে।
ধেয়ে চলে' আসে বাদলের ধারা,
নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা,
কুলায়ে কাঁপিছে কাতর কপোত,
দাদুরি ডাকিছে সঘনে।
গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে।—

কবি তাঁর সবুজ বয়সেই সুরদাসের মুখ দিয়ে স্পষ্ট স্বীকার করে গিয়েছেন—

অপার ভুবন, উদার গগন, শ্যামল কাননতল,
বসন্ত অতি মুগ্ধ মূরতি, স্বচ্ছ নদীর জল,
বিবিধ বরণ সন্ধ্যানীরদ, গ্রহতারাময়ী নিশি
বিচিত্রশোভা শস্যক্ষেত্র প্রসারিত দূরদিশি,
সুনীল গগনে ঘনতর নীল অতি দূর গিরিমালা,
তারি পরপারে রবির উদয় কনককিরণ-জ্বালা,
চকিত-তড়িৎ সঘন বরষা পূর্ণ ইন্দ্রধনু,
শরৎ-আকাশে অসীম বিকাশ জ্যোৎস্না শুভ্রতনু,

*　*　*

ইহারা আমায় ভুলায় সতত কোথা নিয়ে যায় টেনে—

উদাহরণ বাহুল্য নিষ্প্রয়োজন।

তবে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতই বাহিরের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা এবং ভিতরেরও চেতনা স্ফুরণের ফলে এসে দেখা দিয়েছে একটা বিশিষ্ট মানসপ্রত্যয়গত ধারা—যুক্তিবাদের ধারা। এইটিকেই আমি বলেছি রবীন্দ্র-নাথের মধ্যে চতুর্থ ধারা—তবে এটিকে পৃথক একটি ধারা নাম দেওয়া ঠিক হবে কি না সন্দেহ; কারণ এটি স্বতন্ত্র অঙ্গ ততখানি নয় যতখানি একটি ব্যাপক আবহাওয়া হিসাবে বা পিছনের পট হিসাবে আর সকল ধারার আশ্রয় অবলম্বন হয়েছে, তাদের সকলের ও প্রত্যেকের একটা বিশিষ্ট গুণ এনে ধরেছে। গদ্যে—গল্পে উপন্যাসে নাটকে, বিশেষতঃ প্রবন্ধে—এ জিনিষটি বেশি স্ফুট ও প্রকট। রবীন্দ্রনাথ গোড়ায় হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের ভক্ত ছিলেন, আর ব্রাউনিং তাঁর প্রিয় কবি ছিল বোধ হয় বরাবরই। এ দুটি নাম যে রবীন্দ্রনাথের চেতনায় এসে আটকে পড়েছে তা বড়ই বিচিত্র—বোধ হয় বৈপরীত্যের বা পরিপূরণের নিয়মে এ রকম হয়েছে। উপনিষদ আর স্পেন্সার হল উত্তর আর দক্ষিণ মেরু। আর রবীন্দ্রনাথের আত্মরতিসার

মধুর কোমল কান্ত গীতাবলির সম্পূর্ণ বিপরীত জিনিষ হল ব্রাউনিংএর পুরুষালি চিন্তাদার্ঢ্য, অনাত্মকেন্দ্রীয়তা (objectivity)। সে যা হোক রবীন্দ্রনাথের যুক্তিবাদ, বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ, স্থূলভাবে যখন প্রকাশ পেয়েছে তখন তিনি প্রতিমা-পূজার অসারতা প্রতিপন্ন করছেন, রামায়ণের বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন, গুহ্যসাধনতন্ত্রকে পরিহাস করছেন—চিরা-চরিত সামাজিক রীতিনীতির উপর কষাঘাত করছেন। তিনি ভাল করছেন কি মন্দ করছেন, ভুল করছেন কি ঠিক করছেন সে প্রশ্ন আমি আদৌ তুলছি না। আমি বলছি তাঁর প্রকৃতির একটা বৃত্তি বা গুণের পরিচয়। প্রাচীন ঐতিহ্যের, 'মধ্যযুগ'-সম্মত রূপাবলীর অনেক উপকরণ তিনি গ্রহণ করেছেন, শাস্ত্রীয় ও পৌরাণিক বহু উপমা রূপক ও কাহিনী স্বীকার করে নিয়েছেন—কিন্তু তারা সব মস্তিষ্কের ছাঁকনির ভিতর দিয়ে এসেছে, হয়ে উঠেছে বুদ্ধিসমর্থিত, যুক্তিসঙ্গত। ইংরাজীতে এই প্রক্রিয়াটির নাম rationalisation—এ প্রক্রিয়াটির বহু রূপ, বহু ধারা, বহু প্রয়োগ—মনোবিশ্লেষণশাস্ত্র হতে অর্থনীতিশাস্ত্র পর্য্যন্ত ; অনেকেই, প্রায় সকলেই

এ শব্দটি মন্ত্রেরই মত ব্যবহার করেছেন। কারণ সাধারণভাবে ব্যাপকভাবে এ জিনিষ আধুনিক চেতনার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। জিনিষকে অবোধ্য, কুহেলি আবৃত, এলোমেলো করে রাখা নয়—তাকে জাগ্রত চেতনায় ধরে সুস্পষ্ট সুষীম করে ধরতে না পারলে তার স্বস্তি নাই। এই যেমন রবীন্দ্রনাথ পৌরাণিক দেবতা মহাদেবের কথা যখন বলছেন তখন তিনি কোন দেবতার কথা ভাবছেন না, ভাবছেন একটা বিশ্বতত্ত্বের কথা—মহাদেব হলেন মৃত্যু—

তাঁর ববম্ ববম্ বাজে গাল
দোলে গলায় কপালাভরণ
তাঁর বিষাণে ফুকারি উঠে তান
ওগো মরণ, হে মোর মরণ—

কবি নিজেই তাঁর মনোভাবের ব্যাখ্যা দিয়েছেন—

দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে ; আর পাব কোথা ?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা—

এ মনোভাবের পাশ্চাত্য নাম humanism—মানবতা

কি মানব-সর্ব্বস্বতা। আর এ জিনিষ বুদ্ধিবাদের সগোত্র, সহোদর যদি না-ই হয়। কিম্বা শুনুন মদনভস্মের পৌরাণিকতা কবি কি রকমে বুদ্ধিঠাটময় (rationalise) করে ধরেছেন--

> পঞ্চশরে দগ্ধ ক'রে করেছ এ কী, সন্ন্যাসী,
> বিশ্বময় দিয়েছ তা'রে ছড়ায়ে।

তিনি শকুন্তলার ও কুমারসম্ভবের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন—উভয়ত্রই মিলনের পূর্ব্বে একটা বিচ্ছেদের ব্যবস্থা কেন হয়েছে—তাও এই বুদ্ধিতন্ত্রতার পরিচয়। তবে এই বুদ্ধিতন্ত্রতা একটা অপূর্ব্ব সার্থকতা এনে দিয়েছে তাঁর 'উর্ব্বশী' কবিতায়—এখানে বুদ্ধিতন্ত্রতা একটা উদার বিশ্বদৃষ্টিতে রূপান্তরিত হয়েছে। কারণ বুদ্ধিতন্ত্রতা একদিকে যেমন সঙ্কীর্ণতা ও বাহ্যদৃষ্টি এনে দেয়—তেমনি অন্যদিকে তার ঝোঁক জিনিষকে নির্ব্যক্তিক, সার্ব্বজনীন করে ধরবার দিকে। যে সত্য নামরূপগত, সংস্কারগত, প্রথাগত—বিশেষ দেশকালপাত্রের মধ্যে আবদ্ধ—বুদ্ধির আলো তাকে উদারতর বৃহত্তর সর্ব্বসাধারণ করে তুলতে চায়। একেই ত বলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি—বিশেষ তথ্য থেকে সাধারণ বিধানের

দিকে গতি। সকল কবিতার, যথার্থ কবিত্বের মূল রহস্যই হল সার্ব্বজনীন বিশ্বগত অভিব্যঞ্জনা—আনন্ত্যের প্রকাশ বা আভাস। তবে প্রাচীন কবিরা এ জিনিষটি ধরে দিতে চেয়েছেন ভাবের অনুভবের গভীরতা প্রগাঢ়তা দিয়ে, একাগ্রতা অনন্যমুখিতা—কালিদাসের ভাষায়—ভাবস্থিরতার সহায়ে। মিলটন যখন বলছেন,

High on a throne of royal state, which far
Outshone the wealth of Ormuz and of Ind,
... ...
Satan exalted sat, by merit raised
To that bad eminence—

অথবা হোমর যখন বলছেন (ম্যাথু আর্নল্ডের অতিপ্রিয় এক হোমরিক পংক্তি)—

'বন্ধু দুঃখ কর কেন মরতে? পাত্রোকলারও মৃত্যু হয়েছে,
আর সে তোমার চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ ছিল'

কিম্বা ধরুন আমাদের কালিদাসেরই

ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরেতি যাবদ্গিরঃ খে মরুতাং চরন্তি।
তাবৎ স বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা ভস্মাবশেষং মদনং চকার ॥*—

* প্রভু! ক্রোধ সম্বরণ কর, সম্বরণ কর—আকাশের বাণী বাতাসে ছড়িয়ে পড়তে না পড়তে মহাদেবের তৃতীয় নয়ন হতে সঞ্জাত অগ্নি মদনকে ভস্মীভূত করে ফেলল।

তখন একটি সীমাবদ্ধ বস্তুবিশেষের মধ্যে, একটা সঙ্কীর্ণ উদাহরণের মধ্যে অনুভবকে চেতনাকে সংহত করে ধরা হয়েছে—এবং সেই গাঢ়তার ফলেই আমরা পাই একটা অতলস্পর্শতার এবং সর্ব্বব্যাপকতার আভাস, নিবিড় সুতরাং উদার সত্যের ব্যঞ্জনা। আধুনিকেরা সার্ব্বিক বা বিশ্বজনীন ভাবকে আয়ত্ত করতে বা প্রকাশ করতে যান অনুভবের প্রগাঢ়তা দিয়ে নয়, বুদ্ধির প্রয়োগকৌশলের প্রসারতা দিয়ে। রবীন্দ্রনাথও আধুনিকের এই পন্থাই অনুসরণ করেছেন। অনুভবকে যতটা সম্ভব খাঁটি ও গাঢ় রেখেছেন (অতি-আধুনিক বা সাম্প্রতিকেরা এ বালাই দূর করে দিয়েছেন); তারই মধ্যে মনের কৌতূহল, বুদ্ধির জিজ্ঞাসা, চিন্তার সিদ্ধান্ত ঢেলে দিয়েছে একটা উদার দূরপ্রসারী আলো-ছায়ার খেলা।

বুদ্ধিজীবী আধুনিক মানুষের চেতনা ক্রমেই তত্ত্বমুখী হয়ে চলেছে। ইন্দ্রিয়গ্রামের অনুভবকেও সহজভাবে না নিয়ে আর-কিছুর অদৃশ্যরাজ্যের প্রতিচ্ছায়া ও প্রতীক বা আবরণ হিসাবে দেখতে শিখেছে। রবীন্দ্রনাথে এ দুটি ধারাই—ইন্দ্রিয়ের ও ইন্দ্রিয়াতীতের

—বর্ত্তমান এবং যেখানে এ দুটির যৌগিক সম্বন্ধ হয়ে গিয়েছে সেখানেই তাঁর কবিত্বের পরমোৎকর্ষ, উত্তুঙ্গ শিখর সব। ভবিষ্যতের কবিত্ব এইদিক দিয়েই গভীর-ভাবে বৃহত্তরভাবে অগ্রসর হবে মনে হয়।

প্রত্যেক মানুষই বিভিন্ন কয়েকটি মানুষের সমষ্টি। বিশেষতঃ যাঁরা লোকোত্তর পুরুষ তাঁদের চেতনা বহুতর পুরুষের চেতনা-সমষ্টি। বিভিন্ন এমন কি বিরোধী ধারা মিলে কি অপরূপ অভিনব ঐক্যতান সৃষ্টি করতে পারে তার পরিচয় রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা।

অদ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথ

ইংরাজীর পক্ষে শেক্সপীয়র যেমন, জর্ম্মনের পক্ষে গ্যেটে যেমন, রুশের পক্ষে টলষ্টয় যেমন, অথবা ইতালীয়ের পক্ষে দান্তে যেমন, এবং আরো অতীতে লাতিনের পক্ষে ভর্জ্জিল যা, ও গ্রীকের পক্ষে হোমর যা, কিম্বা আমাদের দেশে উত্তরকালীন সংস্কৃতের পক্ষে কালিদাস যা, বাংলার পক্ষে রবীন্দ্রনাথও তাই; একথা বেশি অত্যুক্তি নয়। এই যে সকল দিকপাল তাঁরা প্রত্যেকে তাঁদের আপন আপন ভাষার ও সাহিত্যের রাজা বা রাজচক্রবর্ত্তী, এবং তা হয়েছেন দুটি কারণে। এক, তাঁদের আগে যা ছিল অপক্ক অপরিণত, তাঁদের পরে তা হয়ে উঠেছে পূর্ণবয়স্ক, যা ছিল প্রাদেশিক, গ্রাম্যভাবাপন্ন তা হয়ে উঠেছে অভিরূপভূয়িষ্ঠ সার্ব্বভৌমিক, যা ছিল সাধনার পর্য্যায়ে তা হয়ে উঠেছে সিদ্ধ, যা ছিল একান্তের ঘরোয়া জিনিষ তা হয়ে উঠেছে বিশ্বের জিনিষ। বিশেষ-ভাষাকে বিশেষ-সাহিত্যকে

এই রকমে বিশ্বভাষা ও বিশ্বসাহিত্যে পরিণত করা হল এই মহাপুরুষদের প্রথম ইন্দ্রজাল। দ্বিতীয় ইন্দ্রজাল হল একটা বিশেষ ভাষা ও সাহিত্যের অন্তঃশক্তিকে তার মর্ম্মগত প্রতিভাকে উদ্‌ঘাটিত করে ধরা—একটি জাতির স্বভাব ও স্বধর্ম্ম যা, তার শিক্ষাদীক্ষার মূল তন্ত্র যা, তাকে ব্যক্ত করে প্রতিষ্ঠিত করা ; এ দুটি কাজ—একটি প্রসারতার দিকে, আর-একটি গভীরতার দিকে—অনেক ক্ষেত্রে পরস্পরনির্ভরশীল এবং প্রায়ই ঘটেছে দেখা যায় ধীরে ধীরে ক্রমোন্নতির ফলে নয়, বরং একটা আকস্মিক বা দ্রুত স্ফুরণের কল্যাণে।

ভাষার ও সাহিত্যের শৈশব বা অপোগণ্ড রূপ হল ছড়া পাঁচালী, যাকে বলা হয় লোকসাহিত্য—ballad, folklore ; মার্জ্জিত ও শক্তিমান ভাষা ও সাহিত্য তা থেকে ফুটে বের হয়, বিকশিত হয় পরে। দান্তের ইন্দ্রজাল এদিক দিয়ে প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি যে ভাষার আশ্রয়ে তাঁর কাব্য গড়ে তুললেন তা ছিল লোকভাষা ; অন্যান্য বিবিধ জানপদভাষার একটি মাত্র—কিন্তু এইটিকেই তিনি করে তুললেন সমগ্র ইতালীর ভাষা এবং জগতের চক্ষে ইতালীয় ভাষা।

গ্রীক ভাষা নিয়ে হোমরও মনে হয় প্রায় অনুরূপ অত্যাশ্চর্য্য সৃষ্টি করেছেন। একটা বৃহৎ ও সমুন্নত চেতনার সুর ও ছন্দ তাঁরা তাঁদের ধূল্যবলুণ্ঠিত উপাদানের মধ্যে ভরে দিয়েছিলেন।• গার্হস্থ্য ও গ্রাম্য সীমানায় আবদ্ধ যে কণ্ঠ তাকে অনেকখানিই পরিবর্ত্তিত রূপান্তরিত হতে হয়—বিশ্বকে আহ্বান করে যে কণ্ঠ তাতে পরিণত হতে হলে। আর যেখানে ভাষা ও সাহিত্য এ রকম অপরিপক্ক নয়, ইতিমধ্যেই পেয়েছে একটা পরিণতি ও সৌষ্ঠব, সেখানে এই মহাস্রষ্টারা এসে এনে দিয়েছেন দ্বিতীয় ধরণের রূপান্তর। ভর্জ্জিল, শেক্সপীয়র, গ্যেটে, কালিদাস এই পর্য্যায়ের কাজ করেছেন। শেক্সপীয়রের পূর্ব্বে ইংরাজী যে অপরিণত গ্রাম্য ছিল তা বলা চলে না—যদিও বিদেশীর কাছে শেক্সপীয়র যতখানি জীবন্ত ও পরিচিত ও অন্তরঙ্গ স্পেন্সর, চসার, এমন কি মার্লোও ততখানি নয়। তবে শেক্সপীয়র ব্যক্ত করে ধরেছেন ইংরাজীর গুণ-বৈশিষ্ট্য, তার অন্তঃস্থ সামর্থ্য—ইংরাজীর বৈচিত্র্যময়তা, নমনীয়তা, তার বীর্য্যবত্তা তেজস্বিতা, আর তার ব্যঞ্জনাশক্তি। ফরাসীর ইতিহাসে অন্যান্য সাহিত্যের

ইতিহাস থেকে একটু স্বাতন্ত্র্য আছে। প্রথমতঃ ফরাসী ভাষা ও সাহিত্য বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হয়েছে কোন রকম আকস্মিক পরিবর্ত্তন বা আত্যন্তিক বিপর্য্যয়ের ফলে নয় —সে বৃদ্ধি ও পুষ্টি হল একটা ধীর মন্থর সুশৃঙ্খল ক্রমগতির ফল। ইংরাজীর মধ্যে বরং হঠাৎ অনেকখানি পরিবর্ত্তনের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে রাজনীতির ক্ষেত্রে ইংরাজ ও ফরাসী পরস্পরে ঠিক এর বিপরীত পন্থা অনুসরণ করেছে—ইংরাজের স্বাধীনতার যুদ্ধ চলেছে ধাপে ধাপে ক্রমান্বয় ধরে, from precedent to precedent—ফরাসী সর্ব্বদা চেয়েছে তার জন্য বিপ্লব। সে যা হোক, ফরাসীর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ঠিক এই জন্যই হল এখানে তেমন একজন মাত্র সর্ব্বেসর্ব্বা দিকপাল নাই ; অন্যান্য যে উদাহরণ দিয়েছি সেখানে দেখি এক-একটি জাতির এক-একটি—এবং একটিমাত্র —বিভূতি তার সাহিত্যকে ভাষাকে আপন প্রতিভার ইন্দ্রজালে গড়ে তুলেছেন, কি পূর্ণ পরিণত আত্মসিদ্ধ করে দিয়েছেন। ফরাসীরা বেশি সামাজিক, গণতান্ত্রিক তাই অনেকের সহযোগে, একাধিক বিভূতির অবদানে তাদের ভাষা সাহিত্য গঠিত সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। কর্ণেই,

রাসীন, মোলিয়ের, লা ফন্তেন (বা রাবলে পর্য্যন্ত)—কাকে বাদ দিয়ে কাকে রাখি? তবু এখানেও, একজনকেই প্রতিনিধি হিসাবে গ্রহণ করা যায়; তিনি হলেন রাসীন। রাসীনই ফরাসীর যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য, মর্ম্মের ধর্ম্ম তার বিগ্রহ। কি সে জিনিষ? এক কথায় তা হল 'শ্রী'—সৌষ্ঠব ও লাবণ্য, কান্তি ও সুষমা, হৃদয়বত্তা ও প্রাণময়তা—elegance ও sensitivenessএর পরাকাষ্ঠা। এদিকটি ছাড়া ফরাসীর যে অন্যদিক নাই তা নয়। কর্ণেই দিয়েছেন সেই অন্য দিক—দার্ঢ্য ও বীর্য্য, উদাত্ত গাম্ভীর্য্য, তপোময় কাঠিন্য। কিন্তু বলা যেতে পারে এ হল ফবাসী ভাষার ও সাহিত্যের একটা বিশেষ ধারার গুণ, একটা যেন অর্জ্জিত সামর্থ্য, কি হতে পারে তার পরিচয়—কিন্তু অন্যটি, রাসীন যা, তা ফরাসী ভাষা ও সাহিত্য স্বয়ং, তার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম, তার অন্তরাত্মার স্বতঃস্ফূর্ত্ত রূপায়ন।

ফরাসী সম্পর্কে এই কথাগুলি মনে হল, এ জন্য যে তার প্রধান কথাটি বাংলার পক্ষে বেশ প্রযোজ্য। অবশ্য ফরাসীর মত বাংলায় যে ধীর মন্থর গতিতে ক্রমবিকাশ হয়েছে তা ঠিক বলা চলে না। অন্ততঃপক্ষে

একটি বিপর্য্যয়, বিপ্লবই ঘটেছে—ইউরোপের সংস্পর্শে এসে তার প্রভাবে পড়ে আমাদের ভাষা ও সাহিত্য যে বাঁক নিয়েছে তা প্রায় about-turn বিপরীতমুখতা। কিন্তু এ বিপ্লব একজনের দ্বারা ঘটে নাই। দান্তে বা হোমর ইতালীর বা গ্রীকের স্রষ্টা, কর্ত্তা বা অদ্বিতীয় অধিষ্ঠাতা—সূক্ষ্ম বিচারে ঠিক সেই স্থান বাংলায় রবীন্দ্রনাথকে দিতে যদি আপত্তি হয়, তবে শেক্সপীয়র যে হিসাবে ইংরাজীকে ইংরাজীয় গণ্ডী, তার দ্বৈপায়ন পরিধি, কিম্বা যে হিসাবে টলষ্টয় রুশকে রুশীয় গণ্ডী পার করে বিশ্বের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিয়েছেন সেই হিসাবে, অথবা ভর্জ্জিল বা গ্যেটে যে রকমে লাতিনকে ও জর্ম্মনকে একটা নবস্ফুরণ— কাব্যাত্মার পূর্ণ জাগরণ —এনে দিয়েছেন সেই হিসাবে রবীন্দ্রনাথ বাংলায় একচ্ছত্র বিভূতি। তবে আমার মনে হয় যথাযোগ্য হিসাবে আমাদের মধ্যে তিনি পাবেন রাসীনের আসন। বাংলার যা বিশেষ গুণ, তার অন্তরাত্মার যে সুর ও ছন্দ—অন্তরাত্মার, ভাবময় পুরুষেরই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, হৃদ্গত তন্ময়তা—যার প্রথম মুখ খুলেছে চণ্ডীদাসে— এবং বঙ্কিমও যে ধারাকে প্রসারিত করেছেন—

রবীন্দ্রনাথে তাই পরিণত বিচিত্র তীব্র পূর্ণ প্রকট হয়েছে। এখানেও 'শ্রী'রই এক প্রকাশ। ফরাসীর মত বাংলাতেও ভিন্ন এক ধারা আছে—এদিকের সম্ভাবনা সূত্রপাত করেছেন মধুসূদন, এবং আধুনিকেরা দুইচারজন এই ধারাকে সঞ্জীবিত ও সচল করবার চেষ্টায় আছেন। তবে মধুসূদন বাংলার ঐশ্বর্য্যের দিক—'মাথুর' পর্য্যায়; বাংলার স্বাভাবিক শ্রীর দিক —বৃন্দাবনীয় পর্য্যায়—পরমোৎকর্ষ লাভ করেছে রবীন্দ্রনাথে। তাই রবীন্দ্রনাথও আমাদের মধ্যে একং অদ্বিতীয়ং।